BanglaBook.org

বদনখানি মলিন হলে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বদনখানি মলিন হলে

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বই নিয়ে শুধু মাত্র বই নিয়েই আমাদের এই প্রয়াশ আমারবই.কম। ধ্বংস ও ধসের সামনে বই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। বই আমাদের মৌলিক চিন্তাভাবনার শাণিত অস্ত্র। বইয়ের অস্তিত্ব নিয়ে চারিদিকে আশংকা, নতুন প্রজন্ম চকঝমকের আকর্ষণে বইয়ের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে মুখ। আমাদের এ আয়োজন বইয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ককে অনিঃশেষ ও অবিচ্ছন্ন করে রাখা। আশা করি আপনাদের সহযোগীতায় আমাদের এই ইচ্ছা আরোও দৃঢ় হবে। দুনিয়ার পাঠক এক হও! বাংলা বই বিশ্বের বিবিধ স্থানে, সকল বাংলাভাষীর কাছে সহজলভ্য হোক!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী
সবসময় যিনি আমাদের
সবার পাশে থাকেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

সারা বছর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো একত্র করে বছর শেষে অনেকদিন থেকেই আমি একটা বই বের করে আসছি। এই বছর সেই কাজটি করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম বইটির কলেবর খুবই ক্ষীণকায়। আমার অবাক হবার কিছু নেই, আমি জানি এই বছর লেখালেখি হয়েছে খুবই কম।

আমার যেসব পাঠক পত্রপত্রিকায় আমার প্রকাশিত কলাম আগ্রহ নিয়ে পড়েন, তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এতোকিছু লেখার আছে কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা লিখতে পারি না এই সত্যটি আমি নিজেই মেনে নিতে পারছি না।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১০-০১-২০১২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে...	১১
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও বাংলাদেশ	২০
উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনা	২৩
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরণ অনশন	৩৪
মাত্র এক হাজার পিএইচডি	৩৯
কারও মনে দুখ দিয়ো না...	৪৬
পুলিশ বাহিনী এবং সাধারণ প্রত্যাশা	৫৩
ভূমিকম্প	৫৬
অটোগ্রাফ	৬৩
ধন্যবাদ মোরশেদুল ইসলাম	৬৮
ডিজিটাল হট লাইন	৭০
ঘুরে দাঁড়ানোর সময়	৭৪
গল্পগুচ্ছ : পাঠকের চোখে	৮৩
নূতন প্রজন্মের জন্যে রবীন্দ্রনাথ	৮৭
ওদের নিয়ে কেন স্বপ্ন দেখব না?	৯১
বিজয় দিবসের চল্লিশ বছর	৯৬
নূতন প্রজন্ম ও বিজয় দিবস	৯৯
কলেজিয়েট স্কুলের স্মৃতি	১০১
টিপাই মুখ : একটি প্রতিক্রিয়া	১০৫
নূতন বাংলাদেশ	১০৮
দেশে ফিরে আসা	১১৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

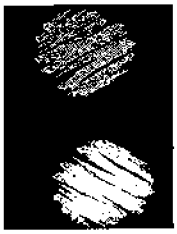

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে...

বছর দুয়েক আগের কথা, আমি একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছি। বাংলাদেশের যে কয়টি সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠনগুলোর একটি– তাদের বিশাল আয়োজন (সংগঠনটিকে প্রকাশ্যে লজ্জা দিতে চাই না বলে নাম উল্লেখ করলাম না)। অনুষ্ঠান শুরু হবে জাতীয় সংগীত দিয়ে, তাই মঞ্চে কয়েকজন উঠেছেন সেটি গাওয়ার জন্য। আমরা দর্শকেরা উঠে দাঁড়িয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সংগীতটি গাওয়া শুরু হলো এবং দুই লাইন গাওয়ার পরই আমি বুঝতে পারলাম, মঞ্চে যারা গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা কেউ দেশের জাতীয় সংগীতটি জানে না। সবাই ধরে নিয়েছে, অন্য একজন জানে এবং তার সঙ্গে গলা মেলাবে, কিন্তু ঘটনাক্রমে একজনও গানের কথাগুলো জানে না। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই গায়কেরা কতটুকু লজ্জা পেয়েছে আমি জানি না, কিন্তু আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। শুধু লজ্জা নয়, আমি ভয়ংকর একটি ধাক্কা খেলাম– তাহলে কি আমাদের দেশে একটি তরুণ প্রজন্ম বড় হচ্ছে, যারা দেশের জাতীয় সংগীতটি জানে না?

শুধু তরুণ প্রজন্ম নয়, আমার ধারণা, আমাদের অনেক বড় মানুষও জাতীয় সংগীতটি জানেন না। তার একটা রাষ্ট্রীয় প্রমাণ পেয়েছিলাম জোট সরকারের আমলে ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ৪৯তম সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় সংগীতটি শুরু না হতেই থেমে গিয়েছিল।

একাধিকবার চেষ্টা করেও যখন সেটি বাজানো সম্ভব হয়নি, তখন সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া একজন সাংসদকে সেটা গাইতে বলেছিলেন। সেই সাংসদ পুরোটুকু জানতেন না, একটুখানি গেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। যদি সবাই পুরো জাতীয় সংগীতটুকু সঠিকভাবে গাইতে পারত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে এই যান্ত্রিক গোলাযোগটাই একটা মধুর ব্যাপার হতে পারত। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে বলতে পারতেন, 'আসুন, আমরা সবাই মিলে জাতীয় সংগীত গেয়ে ফেলি।' মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে মাথা দুলিয়ে গলা ফাটিয়ে জাতীয় সংগীত গাইত পারতেন– হয়তো একটু বেসুরোভাবেই, কিন্তু আমাদের জাতীয় সংগীতের কথাগুলো এত সুন্দর যে বেসুরো হলেই কী এমন ক্ষতি হতো? কিন্তু সেটা হয়নি, পৃথিবীর ৪৬টা দেশের সামনে আমরা নিজেদের বেইজ্জতি করে ছেড়েছিলাম (সেই সম্মেলনের অবশ্যি আরও অনেক ইতিহাস আছে, অনেক দেশের জাতীয় পাতাকাও উল্টো করে টাঙানো হয়েছিল, সেই দেশের প্রতিনিধির অনেকে নিজেরা তাঁদের পতাকা নামিয়ে সোজা করে নিয়েছিলেন!)।

আমি যখন টের পেয়েছি যে একটা আশঙ্কা আছে, আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা সবাই সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাইতে পারে না, তখন থেকে কোনো অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া হলেই আমি তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি, কতজন গাইছে। আমি লক্ষ্য করেছি, খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে কণ্ঠ দেয়। তারা জাতীয় সংগীতটি জানে না, সে জন্য গাইছে না, নাকি সবার সঙ্গে গাওয়ার প্রয়োজন আছে সেটি অনুভব করে না– সেটি কখনো নিশ্চিত হতে পারিনি।

এ রকম সময়ে আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত যেসব বিকৃতি আছে, সেগুলো সংশোধন করার জন্য একটা কমিটি করা হলো এবং ঘটনাক্রমে সেখানে আমাকেও রাখা হয়েছে। সবাই মিলে যখন বিকৃতিগুলো সংশোধন করছি, তখন আমি আবিষ্কার করলাম, প্রাইমারি স্কুলের বাংলা বইয়ের শুরুতেই আমাদের জাতীয় সংগীতটি দেওয়া হয়েছে। একটি ছোট বাচ্চার জন্য জাতীয় সংগীতটি শিখে ফেলার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সময়– কাজেই এটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার আরও একটি বিষয় মনে হলো– আমাদের সংবিধানে জাতীয় সংগীতের জায়গায় লেখা আছে 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা-র প্রথম দশ চরণ' এবং পাঠ্যবইয়ে সেই দশ লাইন তুলে দেওয়া আছে। কিন্তু সংগীতটি যখন গাওয়া হয়, তখন কিন্তু হুবহু এভাবে গাওয়া হয় না। কোনো লাইন বা লাইনের অংশ দ্বিতীয়বার গাওয়া হয়, কোনো লাইন মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে আবার শুরু করা হয় এবং যারা গায়ক বা গায়িকা, তারা সেগুলো জানেন– আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সেগুলো জানি না। কাজেই আমার মনে হলো, আমাদের ছেলেমেয়েদের সংবিধানে উল্লেখ করা জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে গাওয়া হয়, সেটাও জানিয়ে দেওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন কমিটির অন্য সদস্যদের

www.BanglaBook.org

কাছে আমি যখন সেই প্রস্তাবটি করেছি, তখন তাঁরা সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। তাই গত দুই বছরের প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবইয়ে আমাদের জাতীয় সংগীতের নিচে নতুন একটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে, 'গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণ পাঠ'। সেটি আমি এই লেখার সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছি। আমার ইচ্ছা, যাঁরা এখনো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জাতীয় সংগীতটি (যেটি পৃথিবীর মধুরতম একটি সংগীত) জানেন না, তারা এই অংশটি কেটে তাঁদের পকেটে বা ব্যাগে রাখবেন। প্রতিদিন সময় করে এক-দুইবার করে পড়বেন, দেখতে দেখতে তাঁরা আমাদের জাতীয় সংগীতটি ঠিক যেভাবে গাওয়ার কথা, সেটি তাঁরা শিখে যাবেন।

কথাগুলো শিখে যাওয়ার পর বাকি থাকল সুর। এ ব্যাপারে আমি একেবারে অজ্ঞ, আমার যে গলায় কোনো সুর নেই, শুধু তা-ই নয়, আমার কানেও কোনো সুর নেই। আমার সংগীতজ্ঞ বন্ধুরা যখন সুরের সুক্ষ্ম তারতম্য নিয়ে কথা বলেন, তখন আমি একধরনের বিস্ময় নিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি! 'আমার সোনার বাংলা' গানটি একসময় ছিল শুধু একটি রবীন্দ্রসংগীত, যখন সেটাকে আমরা আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঠিক করেছি, তখন সেটি শুধু গায়ক-গায়িকাদের জন্য থাকেনি– আমাদের সবার জন্য হয়ে গেছে। এখন এটি শুধু অল্প কিছু গায়ক-গায়িকা গাইবেন না, এ দেশের ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা, সাংসদ-মন্ত্রী, পুলিশ-মিলিটারি– সবাই গাইবে। যার গলায় সুর আছে সে যে রকম গাইবে, ঠিক সে রকম যার গলায় সুর নেই সেও গাইবে। তাই এর সুরটিকে সহজ করে নেওয়া হয়েছিল।

আমি ইন্টারনেটে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত জাতীয় সংগীত খুঁজেছি, সঠিকভাবে খোঁজা হয়েছে কি না জানি না, তবে খুঁজে পাইনি। আমার গায়ক বন্ধুরা আমাকে বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত জাতীয় সংগীতের যন্ত্রসংগীত রূপ আছে, তবে মূল গানটি নেই। আমার বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, এ রকম অনেক কিছুই পৃথিবীতে আছে, তাই আমার নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে খুব বেশি গুরুত্ব দিই না। ইন্টারনেটের ইউটিউবে যন্ত্রসংগীত এবং জাতীয় সংগীত দুটি-ই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি কোনো একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় কিছু নয়। আমার গায়ক বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে আমি ছায়ানটের একটি সিডির সন্ধান পেয়েছি, যেটিতে লেখা আছে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুর'– আমার মনে হয়, সেটাকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

www.BanglaBook.org

কিছুদিন আগে 'জাগরণের গান' হিসেবে বেশ কটি দেশাত্মবোধক গান প্রকাশ করা হয়েছে, এর প্রথমটিতেও আমাদের জাতীয় সংগীত আছে– যেটি এখন ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করা যায়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সংগীত গায়– আমি আবিস্কার করেছি, তাদের গলায় অপূর্ব সুর, কিন্তু কথাগুলো সঠিক নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি তাদের কাছে 'গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণ পাঠ' ধরিয়ে দেওয়ার পরও তারা নিজেদের মতো করে জাতীয় সংগীতটি গাইতে পছন্দ করে। যার অর্থ, তারা যেখান থেকে শিখে এসেছে, সেখানেই অনেক যত্ন করে তাদেরকে এভাবে শেখানো হয়েছে– তারা চেষ্টা করেও তার বাইরে যেতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করে লেখা আছে, সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, তখন পুরোটুকু গাইতে হবে। তার পরও দেখি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অর্ধেক গেয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। খুব সহজ ভাষায় বলা যায়, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও জাতীয় সংগীত নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম আছে। আমার ধারণা এটা ঠিক করা দরকার।

আমি যখন ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্র, তখন আমাদের স্কুলে কিছু মানুষ এসে স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকদের পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দুর্বোধ্য ভাষার সেই জাতীয় সংগীতটি আমাদের প্রতিদিন গাইতে হতো এবং সেটি এক সময় আমাদের মস্তিষ্কে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমার খুব খারাপ লাগত যে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতটি আমার মস্তিষ্কে জায়গা দখল করে বসে আছে এবং চেষ্টা করেও আমি সেটা আমার মাথা থেকে সরাতে পারি না– আমি সেটা ভুলে যেতে পারি না! তবে খুবই আনন্দের ব্যাপার, ইদানীং আমি পরীক্ষা করে দেখছি, ছেলেবেলায় শেখা অনেক কবিতা আমার মুখস্থ আছে, কিন্তু পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' আমার মস্তিষ্ক থেকে বিদায় নিয়েছে– আমি চেষ্টা করেও এখন সেটা মনে করতে পারি না।

তবে এ ঘটনা থেকে আমি একটি জিনিস বুঝতে পেরেছি, একটা ছোট শিশুকে শিশু অবস্থায় জাতীয় সংগীত শিখিয়ে দেওয়া হলে সারা জীবন সে সেটি মনে রাখবে। কাজেই আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব, প্রতিটি স্কুলের এক-দুজন শিক্ষককে সঠিক কথা আর সুরে জাতীয় সংগীতটি শিখিয়ে দেওয়া এবং তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপর দায়িত্ব দেওয়া, স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন সেটি গেয়ে তাদের দিনটি শুরু করানো। দেশের বড় করপোরেশনগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কিছু কাজ করার কথা– তারাও সাহায্য করতে পারে।

আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি শুধু একটি গান– আমাদের কাছে সেটি আরও অনেক কিছু। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি মিলিটারি পৃথিবীর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল– পরদিন সারা পৃথিবীর রেডিওতে সেই খবরটি প্রচারিত হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা থেকে পরদিন এই খবরটি প্রচার করেছিল খুব সংক্ষিপ্তভাবে দুই-এক লাইনে– তারপর 'আমার সোনার বাংলা' গানটি প্রচার করেছিল। একবার-দুইবার নয়, অসংখ্যবার। সেই গানের কথা ও সুর আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল– আমরা তখন কেউ জানতাম না, কত রক্ত দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতাটুকু অর্জন করতে পারব। আমাদের প্রজন্মের কাছে এই জাতীয় সংগীতটি শুধু একটি সংগীত নয়– এটি অনেক কিছু। এখন পর্যন্ত একবারও হয়নি, যখন কেউ এই গানটি গেয়েছে এবং তার কথাগুলো শুনে আমার চোখ ভিজে আসেনি।

২.

ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। কিন্তু ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আমার অসম্ভব প্রিয়। কেউ যেন মনে না করে, আমি একজন খাঁটি বোদ্ধা। ফুটবল শারীরিক খেলা, একজন খেলোয়ার ক্রমাগত আরেকজন খেলোয়াড়ের গায়ে গা লাগিয়ে হুটোপুটি করেন বলে আমার 'সুকুমার' মনোবৃত্তি আহত হয়– তাই এই খেলাটি আমি দেখতে পারি না। সেই তুলনায় ক্রিকেট ভদ্র মানুষের খেলা, একজন খেলোয়াড় আরেকজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ না করে খেলে যান, তাই আমি খেলাটি পছন্দ করি– আসলে সে রকম কিছু নয়। ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না, কারণ সেই সময়টাতে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশটাতে বিদেশের পতাকা আকাশে উড়তে থাকে এবং দেখে মনে হয়, পুরো দেশটাকে বুঝি বিদেশিরা দখল করে ফেলেছে। জাতীয় পতাকা মোটেও এক টুকরো কাপড় নয়– এটা অনেক বড় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, ইচ্ছে করলেই একটা দেশে অন্য দেশের পতাকা তোলা যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে যদি অন্য দেশের পতাকা তুলতে হয়, তাহলে তার আগে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়–

www.BanglaBook.org

অন্য দেশের পতাকা থেকে উঁচুতে নিজের দেশের পতাকাটি টাঙাতে হয়। আমি দেখেছি, আমাদের রাষ্ট্র সে কথাগুলো কাউকে মনে করিয়ে দেয় না। দেশের মানুষ পুরোপুরি নির্বোধের মতো নিজের দেশকে অপমান করতে থাকে, কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমি ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ অসম্ভব ভালোবাসি, কারণ এই সময়টাতে সারা দেশের মানুষ লাল-সবুজের রঙের খেলায় মেতে ওঠে। এই খেলায় আমার নিজের দেশ খেলছে এবং আমরা ক্রমাগত 'বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ' করে চিৎকার করছি। দেশকে ভালোবাসার আর দেশকে নিয়ে গর্ব করার একটা সুযোগ করে দেয় এই ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট খেলা। যাঁরা ক্রিকেট বোদ্ধা, তাঁরা খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন, আমি পারি না। আমি খেলা দেখতে পারি, যখন সেই খেলায় বাংলাদেশ জিততে থাকে, শুধু তখন! বাংলাদেশ যদি কখনো কোনো খেলায় হেরে যায়, তখন দুঃখে আমার বুক ভেঙে যায়, মনে হয় হাউমাউ করে কাঁদি।

এই দেশের মানুষেরা আজকাল লাল-সবুজ রঙের কাপড় পরে, মাথায় ফেটি বাঁধে। লাল-সবুজ আমাদের জাতীয় পতাকার রং। মার্চ মাস আসছে, আমাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অসংখ্য জাতীয় পতাকা তৈরি হবে এবং আকাশে ওড়ানো হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' বলে লাইব্রেরিতে একটি অংশকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত যত বই, যত তথ্য– সবকিছু সংগ্রহ করা হচ্ছে। তার দেয়ালে ঝোলানোর জন্য আমি সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকাটি কিনে এনেছিলাম। সেটি ঝোলানোর সময় মেপে আমি আবিষ্কার করলাম, সেটি সঠিক মাপে তৈরি নয়। পুরোটি কেটে আমাকে নতুন করে জাতীয় পতাকা তৈরি করতে হয়েছে। এখন আমি চোখ খোলা রেখে তাকাই এবং একধরনের দুঃখ মেশানো বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করি যে বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা নিয়েও একধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে। যে কেউ যেকোনো মাপে জাতীয় পতাকা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে, কেউ তাকে থামাচ্ছে না। জাতীয় পতাকার লাল-সবুজ রংটি সঠিক– এ ছাড়া আর কিছু সঠিক নয়। একটি সবুজ আয়তক্ষেত্রে মোটামুটি আকারের একটা লাল বৃত্ত বসিয়ে দিলেই সেটা জাতীয় পতাকা হয়ে যায় না। কিন্তু সেটাই এ দেশে ঘটছে।

অথচ জাতীয় পতাকার মাপটি মোটেও কঠিন নয়। দশ এবং ছয় এই দুটি সংখ্যা মনে রাখলেই জাতীয় পতাকার পুরো মাপটি মনে রাখা সম্ভব। জাতীয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পতাকার দৈর্ঘ্য যদি দশ ফুট হয়, তাহলে তার প্রস্থ হবে ছয় ফুট। এখন আমার জানা দরকার, লাল বৃত্তের সাইজ, দশ থেকে ছয় বিয়োগ দিলেই সেটা বের হয়ে যাবে, অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে চার ফুট। বৃত্তটি যদি আয়তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে বসানো হতো, তাহলে আর কিছুই জানতে হতো না– কিন্তু আমাদের জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তটি পতাকা টাঙানোর দণ্ডটির দিকে একটু সরে এসেছে। কতটুকু সরে এসেছে, সেটা অনেকভাবে বের করা যায়, সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এ রকম। বাঁ– দিকে পতাকার খুঁটি থাকলে ডান দিকে এক ফুট কাপড় ভাঁজ করে আয়তক্ষেত্রটি নয় ফুট বাই ছয় ফুট করে ফেলতে হবে। এখন বৃত্তটি বসাতে হবে এই নয় ফুট বাই ছয় ফুট আয়তক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে। দশ ফুট বাই ছয় ফুট সাইজের জাতীয় পতাকা না করে কেউ যদি পাঁচ ফুট বাই তিন ফুট বা আরও ছোট করতে চায়, তাহলে ঠিক একই মাপে সবকিছু কমিয়ে আনতে হবে।

আমার ইচ্ছা, রাষ্ট্র এই বিষয়গুলোতে একটুখানি নজর দিক। যে ফেরিওয়ালা জাতীয় পতাকা বিক্রি করছে, তাকে বাধ্য করুক সঠিক মাপের জাতীয় পতাকা তৈরি করতে। স্কুলের বাচ্চাদের উৎসাহ দিক লাল-সবুজ কাগজ কেটে সঠিক মাপের জাতীয় পতাকা তৈরি করতে। একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছর পরও আমরা সঠিক জাতীয় পতাকা খুজে পাব না– এটা হতে পারে না।

জাতীয় পতাকা নিয়ে আমাদের একটা চমৎকার বিষয় আছে, যেটা অন্য দেশগুলোর নেই। সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় পতাকা। সেই পতাকার মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রটি বসানো ছিল। প্রথম দিন যখন আমি এই মানচিত্র দেখেছিলাম, তখন আমার বুকের ভেতর যেভাবে রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল, আমি এখনো সেটি অনুভব করতে পারি। মুক্তিযুদ্ধের সেই পতাকাটি একটু পরিবর্তন করে এখন আমরা আমাদের নতুন জাতীয় পতাকা পেয়েছি– কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সেই পতাকাটি কিন্তু হারিয়ে যায়নি। আমরা কিন্তু সেই পতাকাটিকে আমাদের হৃদয়ের ভেতরে স্থান করে দিয়েছি। আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি, তরুণ প্রজন্ম এখনো মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটিও সমান মমতায় নিজের কাছে রাখছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটিও আমরা গভীর মমতায় ঝুলিয়ে রেখেছি।

গাড়িতে পতাকা লাগানোর একটি ব্যাপারে আছে– শুধু মন্ত্রীরা গাড়িতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পতাকা লাগাতে পারেন। এই বিষয়টি আমি ভালো বুঝতে পারি না। জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকার ওপরে দেশের জনগনের সবার একধরনের অধিকার আছে। জাতীয় পতাকাটিকে যথাযথ সম্মান দেখানো হলে যে কোনো মানুষের সেটি ব্যবহার করার অধিকার থাকার কথা ছিল। বিজয় দিবস কিংবা স্বাধীনতা দিবসে অনেকেই গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগিয়ে নেন, আমি দেখেছি, পুলিশ তাদের থামিয়ে পতাকা খুলে ফেলতে বাধ্য করছে! মুক্তিযুদ্ধের পতাকাটি লাগালে নিশ্চয়ই পুলিশ কিছু বলতে পারবে না।

৩

আমাদের জাতীয় জীবনে একটি চরম লজ্জা, দুঃখ, অপমান, ক্ষোভ, ক্রোধ ও বেদনার ইতিহাস আছে। সেটি হচ্ছে, জোট সরকারের আমলে পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী এবং পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর কেন্দ্রীয় সংগঠক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মন্ত্রী হয়ে যাওয়া। যারা এই দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, তারা সেই দেশের জাতীয় পতাকাটি তাদের গাড়িতে লাগিয়ে এই দেশের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে– আমরা বিস্ফারিত চোখে সেটা তাকিয়ে দেখেছি। আমার মাতৃভূমির এর চেয়ে বড় অপমান আর কখনো হয়নি। 'আমার সোনার বাংলা' গানের কথা দিয়ে এই দেশের সব মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,/ ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি'!

আমার মায়ের বদনখানি মলিন হয়েছে– যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমার মায়ের বদনে আবার হাসি ফোটাতে হবে। দেশের প্রতিটি মানুষ কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সরকারের সেটি মনে আছে তো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবসি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা. তোর মখের বাণী আমার কানে লাগে সধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও বাংলাদেশ

যাঁরা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার এবং দেশের আইনকানুন নিয়ে নির্মোহ, বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ আলোচনা পড়তে চান, তাঁদের এ লেখাটি পড়ার প্রয়োজন নেই। এটি সে রকম একটি লেখা নয়, এটি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে অসম্ভব পছন্দ করে, সে রকম একজন মানুষের অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট একটি লেখা।

আমি প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে অসম্ভব পছন্দ করি এবং তার চেয়ে বেশি সম্মান করি। আমি জানি, এ দেশে আমার মতো এ রকম মানুষের কোনো অভাব নেই। মনে আছে, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবরটি পেয়ে আমি আনন্দে কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষের মতো চেঁচামেচি করেছিলাম। ক্রিকেট বাংলাদেশ টিম যখন পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের মতো টিমকে হারায়, তখন টেলিভিশনের সামনে লাফঝাঁপ দিয়ে আনন্দে চিৎকার করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটি খবর শুনে আনন্দে লাফঝাঁপ দিয়ে চিৎকার করার ঘটনা আমার জীবনে খুব বেশি ঘটেনি। আমার একজন পরিচিত মানুষ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেটি আনন্দের কারণ ছিল না, আনন্দের কারণ ছিল এক ধাক্কায় বাংলাদেশের মর্যাদার জায়গাটি অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়াটুকু। যাঁরা জীবনের একটা অংশ বিদেশের মাটিতে কাটিয়ে এসেছেন, শুধু তাঁরাই জানেন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিটিকে বিদেশের মাটিতে কী নিষ্ঠুরভাবে তাচ্ছিল্য এবং অসম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একা সেটিকে কত বড় একটি মর্যাদার আসনে নিয়ে গেছেন।

কিছুদিন আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে বাংলাদেশের ওপর খুব চমৎকার একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মানুষের মানসিকতার স্বরূপ বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছিল, পাকিস্তানের জনগনের

www.BanglaBook.org

কাছে জাতীয় বীর হচ্ছেন দুর্বৃত্ত (rogue) নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খান, যিনি বেআইনিভাবে দেশে-বিদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্র চোরাচালানি করেন আর বাংলাদেশের জাতীয় বীর হচ্ছেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, যিনি ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দরিদ্র নারীদের সাহায্য করেন।

সেই প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে এ দেশের সরকার খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে হেনস্থা করতে শুরু করেছে। এটি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এজেন্ডা ছিল এবং আগে হোক পরে হোক, এটি নিশ্চয়ই শুরু হতো। গত ডিসেম্বর মাসে নরওয়ের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান এই হেনস্থাকরণ-প্রক্রিয়া শুরু করার চমৎকার একটা সুযোগ করেছিল। নব্বইয়ের দশকে নিস্পত্তি হয়ে যাওয়া সেই বিষয়টির সূত্র ধরে প্রথমেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে এমন কঠোর ভাষায় কিছু বক্তব্য দিলেন, যেটি শুনে এই দেশের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষ হতবাক হয়ে গেল। আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা সম্মানী মানুষের, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানী মানুষের সম্মান রক্ষা করে কথা বলি, তাই প্রধানমন্ত্রীর সেই কথাগুলো এ দেশের অনেক মানুষকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। আমাদের অর্থমন্ত্রী প্রথমে যৌক্তিকভাবে কিছু কথা বললেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তখন তাঁকে রূঢ় ভাষায় কথা বলার জন্য চাপ দেওয়া হলো এবং তখন তিনিও একই ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। সাধারণভাবে বাঁশের চাইতে কঞ্চি বড় হয়ে থাকে, তাই সবচেয়ে কদর্যভাবে কথা বলতে শুরু করল ছাত্রলীগ। তাদের কথাগুলো লেখার মতো নয়, যত দূর মনে পড়ে, তারা নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দিতে থাকে। মৌখিক খিস্তির পর আমরা রাষ্ট্রীয় হেনস্থার স্বরূপটি দেখতে পেলাম। বাংলাদেশের আনাচেকানাচে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বহু মামলা হতে লাগল এবং আমরা দেখতে পেলাম, প্রফেসর ইউনূস সারা দেশে ছোটাছুটি করে সেই মামলার জামিন নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যে মানুষটি সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানী মানুষদের একজন, তাঁকে তাঁর দেশের সরকার এ রকমভাবে অসম্মান করতে পারে, সেটি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। আজকের (বৃহস্পতিবার) খবরের কাগজে দেখেছি, সরকার তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অপসারণ করেছে। আমি নিশ্চিত, সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম আইনকানুন দেখনো হবে, কিন্তু পুরো বিষয়টি এমনভাবে ঘটে এসেছে যে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এ দেশের সাধারণ মানুষ আর সেগুলো বিশ্বাস করবে না। তারা ধরেই নেবে, এটি হচ্ছে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্থা

www.BanglaBook.org

করার আরও একটি ধাপ, শত হাইকোর্ট দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে তাদের বিশ্বাস থেকে টলানো যাবে না।

এ খবরটি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এবং অবিশ্বাস্য গুরুত্বের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ কয়েক বছর আগে জেএমবি যখন সারা দেশে একসঙ্গে বোমা ফাটিয়েছিল, তখন দেশের খুব বড় একটা ক্ষতি হয়েছিল, পৃথিবীর অনেকেই ধরে নিয়েছিল, আমাদের দেশটি বুঝি জঙ্গিদের। অনেক দিন পর আবার দেশের খুব বড় একটা ক্ষতি হলো, সারা পৃথিবী ধরে নিল, এ দেশের সরকার হচ্ছে অকৃতজ্ঞ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। যে মানুষটি এ দেশের মর্যাদা সারা পৃথিবীর সামনে উঁচু করেছেন, এ দেশের সরকার তার পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করছে তাঁকে অসম্মান করার জন্য।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মানুষ। আমাদের সবারই ইচ্ছে, এ বিষয় নিয়ে গবেষনা হোক, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হোক এবং ভেতরের সত্যটুকু বের হোক। কতটুকু আশার ব্যাপার, কতটুকু স্বপ্ন, কতটুকু বাস্তব এবং কতটুকু অবাস্তব, সেই তথ্যগুলো আমাদের সামনে প্রকাশিত হোক, কিন্তু তার মানে কি এই বিষয়ের স্বপ্নদ্রষ্টাকে অসম্মান করা হবে? এবং এত স্থূলভাবে?

সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সামনে পরিচিত হতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। এই সরকার বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, এই দশকে পৃথিবীতে বাংলাদেশ পরিচিত হয় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে দিয়ে। কাজেই যখন এ দেশে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে অসম্মান করা হয়, তখন যে বাংলাদেশকেই পৃথিবীর সামনে অসম্মান করা হয়, সেই সহজ কথাটি কি এই সরকারের ভেতর কেউ জানে না?

প্রকাশ্যে থুথু ফেলা অশোভন কাজ। যদি ফেলতেই হয়, তাহলে নিচের দিকে ফেলতে হয়। কখনোই ওপরের দিকে কাউকে লক্ষ্য করে থুথু ফেলতে হয় না। তাহলে অবধারিতভাবে সেই থুথু নিজের মুখের ওপর এসে পড়ে।

এই সরকার কি জানে, তারা মুখ ওপরের দিকে করে থুথু ফেলছে?

দৈনিক প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক ভাবনা

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সমস্যা, সেই সমস্যা মেটানোর জন্যে এই প্রথমবার একটা শিক্ষানীতি দাঁড়া করানো হয়েছে, সেই নীতি কার্যকর করার জন্যে কাজ শুরু হয়েছে। শিক্ষা অনেক বড় একটি ব্যাপার– সেই প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু, তারপর প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক হয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে শেষ। এর প্রত্যেকটা স্তর নিয়েই আসলে বিশাল আলোচনা করা যায়- এই লেখাটিতে অবশ্যি সেরকম কিছু চেষ্টা করা হয় নি– এখানে শুধু মাত্র উচ্চ শিক্ষা নিয়ে একটু কথা বলা হয়েছে। তাও পুরো বিষয়টি নিয়ে নয়, উচ্চ শিক্ষার সম্ভাব্য একটা নূতন ধারণা নিয়ে।

আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, সেই শুরু থেকেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা বিস্ময়কর তথ্য আবিস্কার করেছি– সেটি হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো হলেও তাদের একটা ছোট অংশ– বড় জোর ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিজের বিভাগে আনন্দ নিয়ে ভর্তি হয়। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দের বিভাগে ভর্তি হতে পারে না, তারা ভর্তি হয় অপছন্দের বেশিরভাগ একটা বিভগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটুকু তারা শুরু করে একটি দীর্ঘশ্বাস দিয়ে এবং সেই দীর্ঘশ্বাস থেকে তারা তাদের জীবনে কখনো মুক্তি পায় না।

পছন্দের বিভাগটি মূলতঃ ঠিক হয় চাকরির বাজার দিয়ে। সে কারণে এক সময় কম্পিউটার সায়েন্স খুব প্রিয় বিভাগ ছিল, মোবাইল টেলিফোন এসে কম্পিউটার সায়েন্সকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং জাতীয় বিভাগগুলোকে বসিয়েছিল। দেশে স্যামসাংয়ের মত বড় বড় প্রতিষ্ঠান আসছে তাই এখন আবার কম্পিউটার সায়েন্স জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে

www.BanglaBook.org

ব্যবসা প্রশাসন বহুদিন থেকে জনপ্রিয় একটা বিভাগ যে কারণে স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র কমে গেছে, সবাই দল বেধে কমার্স পড়তে শুরু করেছে। কমবয়সী ছেলে মেয়েদের কারো কারো নিজস্ব পছন্দের বিভাগ থাকে; কেউ কেউ বিজ্ঞানী হতে চায়, কেউ কেউ সাহিত্য নিয়ে পড়তে চায়– তখন তাদের অভিভাবকেরা এসে ধমক দিয়ে তাদের স্বপ্নকে দেশ ছাড়া করেন, জোর করে চাকরির বাজারে জনপ্রিয় একটা বিভাগে ভর্তি করে দেন। ছেলে মেয়েরা মুখ কালো করে সেই বিষয় নিয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবার পরই আমরা ছাত্রছাত্রীদের হতাশার চিহ্ন দেখতে পাই। যে বিষয়ে পড়ার আগ্রহ নেই জোর করে সেই বিষয়টি পড়ার মত কষ্ট আর কী হতে পারে? আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও প্রায় সময়ই ঠিক করে পড়ান না। অনেক সময়ে যথেষ্ট ক্লাস হয় না, শিক্ষক কিছু প্রশ্ন দাগ দিয়ে দেন। ছেলেমেয়েদের সারা বছর পড়তে হয় না, পরীক্ষার আগে লম্বা সময়ের বিরতি থাকে- সেই বিরতিতে পড়ে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেয়। প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই পরীক্ষা পদ্ধতি জটিল এবং প্রাচীনপন্থী। পরীক্ষার খাতায় কলম না ছুঁয়ে খাতা দেখা হয়। শিক্ষকদের অবিশ্বাস করা হয় কাজেই একজন দেখলে হয় না- দুজনকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে হয়, সেখানে বড় ফারাক হলে আরেকজন। যখন অল্পকিছু ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া করত তখন সেই হাস্যকর নিয়মটি টিকে ছিল– এখন টিকছে না। পরীক্ষার ফল দিতে বছর পার হয়ে যাচ্ছে। চার বছরের কোর্স শেষ হতে হতে ছয় সাত বছর লেগে যায়। যে বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল তারা মধ্য বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যায়, সময়ের কী নিদারুন অপচয়!

মাঝে মাঝে মনে হয় সবাই মিলে দেশকে বুঝি পিছনে টেনে রাখতে চাইছে। সংসদের আলোচনা শুনলে মনে হয় বলি, হে ধরণী দ্বিধা হও ভেতরে ঢুকে যাই! সব দেশ যখন জোর কদমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা তখন হাটি হাটি পা করে অগ্রসর হচ্ছি– তবে ভরসার কথা যত কমই হোক আমরা কিন্তু সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি– দেশের অর্থনীতি ভালো হচ্ছে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করি এই মুহূর্তে কয়েক হাজার তথ্য প্রযুক্তিবিদ দরকার, কিন্তু আমাদের কাছে কেউ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভাগগুলোর সীট সীমিত, চেষ্টা করলেও তৈরি করতে পারব না। দেশের প্রয়োজন, কিন্তু পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলেও সেগুলো দিতে পারছি না। ছেলে মেয়েরা আগ্রহ নিয়ে পড়তে রাজী আছে কিন্তু আমরা সুযোগ করে দিতে পারছি না। এই দুঃখ কোথায় রাখি?

www.BanglaBook.org

২.

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন যুক্তরাষ্ট্রে (এক সময় ছিল আমাদের দেশে– তখন পৃথিবীর অন্যেরা পড়ালেখাই শুরু করেনি!) সেখানকার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে আইভি লিগ, তাদের একটি হচ্ছে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়। নিউইয়র্ক স্টেটের উত্তরে ইথাকা নামের শহরে এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। আমার জানামতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়াশোনার জন্যে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার নিয়ম কানুনগুলো ভারী মজার, ইচ্ছে করলে যে কেউ তাদের ওয়েব সাইটে গিয়ে সেগুলো দেখতে পারে। আমি কিছু কিছু বিষয় এখানে লিখছি:

১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোন্ বিভাগে পড়াশোনা করবে সেটি ঠিক করে দুই বছর লেখাপড়া করার পর।

২) একজন ছাত্র বা ছাত্রী যে কোনো বিভাগে পড়াশোনা তো করতেই পারে (তাদের ভাষায় major করতে পারে)। তারা ইচ্ছে করলে বিভিন্ন কোর্স সমন্বয় করে সম্পূর্ণ নূতন একটা বিভাগ তৈরি করে সেটাতেও স্নাতক ডিগ্রি নিতে পারে।

৩) দুটি কাছাকাছি বিভাগের প্রয়োজনীয় কোর্সগুলো নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করলে একই সাথে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে major করতে পারে। (ইচ্ছে থাকলে কিংবা ধৈর্য্য থাকলে তিনটি কিংবা আরো বেশি বিভাগেও major করতে পারে।) উদাহরণ : পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত।

৪) একটি বিভাগের প্রয়োজনীয় কোর্স নিয়ে সেই বিভাগে major এবং অন্য বিভাগের কিছু কোর্স নিয়ে সেই বিভাগে minor করতে পারে।

৫) সাধারণ ডিগ্রির সময়সীমা চার বছর, ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করলে পাঁচ বছর সময় নিয়ে দুটি পুরোপুরি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে একেবারে আলাদা ডিগ্রি নিতে পারে।

আমরা যদি তাদের কোর্সগুলোতে যাই তাহলে সেখানেও কিছু চমকপ্রদ বিষয় দেখতে পাব। তার কয়েকটি হচ্ছে:

১) আনুমানিক ১২০ ক্রেডিট করা হলে তারা স্নাতক ডিগ্রি পেয়ে যায়– এর মাঝে অর্ধেকের মতো নিতে হয় নিজের বিভাগের, বাকীগুলো নিজের বিভাগের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২) প্রায় ১০ শতাংশ কোর্স নিতে হয় কেমন করে গুছিয়ে লিখতে হয় শুধু সেটা শেখার জন্যে!

৩) শারীরিক শিক্ষার উপর বাধ্যতামূলক কোর্স নিতে হয়– সবাইকে সাঁতার শিখতে হয়!

৪) কোনো কোনো ফ্যাকাল্টিতে বিদেশি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক।

৫) বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদেরকেও সোস্যাল সায়েন্সের কোর্স নিতে হয় প্রায় ১০ ক্রেডিট এবং কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ১০ ক্রেডিট।

পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়মকানুনগুলো যদি আমরা একটু গভীরভাবে দেখি তাহলে আমরা একটা চমকপ্রদ বিষয় আবিষ্কার করি। সেটি হচ্ছে সেখানে কোনো ছাত্রছাত্রীকে একটা নির্দিষ্ট বিভাগে জোর করে আটকে ফেলা হয় না, সে ইচ্ছে করলে যে কোনো বিভাগ থেকে যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে।

এটি যে কতো বড় একটা ব্যাপার কেউ কি চিন্তা করে দেখেছে?

৩.

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা কি এই বিষয়গুলো চালু করতে পারি? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতমধ্যে এধরনের বিষয় শুরু হয়েছে। অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটি বিষয়ে মূল ডিগ্রী নেবার পাশাপাশি অন্য বিষয়ে minor ডিগ্রি নিতে শুরু করেছে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের পরিবর্তন হয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে একটি খারাপ প্রশাসন ভালো প্রশাসনের সমস্ত অর্জন অল্প কয়েকদিনে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার ধারনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ খানিকটা অনিশ্চিত এবং সে তুলনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরই ঠিকভাবে গড়ে উঠার সুযোগ রয়েছে। এক সময়ে শুধু বিত্তশালী মানুষের সন্তানেরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, এখন মধ্যবিত্তরাও কষ্ট করে তাদের সন্তানদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাচ্ছে। সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েগুলো এখনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসছে কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে ঠিক করে গড়ে তুলতে না পারি, প্রাচীনপন্থী লেখাপড়া দিয়ে অসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি তাহলে তাদের মেধারও কোনো মূল্য

www.BanglaBook.org

থাকে না। কিছু কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেডিট ফি অনেক কম– পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েগুলো যদি ভালো শিক্ষকদের নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

কাজেই আমার ধারণা ভবিষ্যতে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে এবং আমরা যদি এখনই প্রস্তুতি না নিই সেই প্রতিযোগিতায় আমরা হেরে যাব। দেশের সাধারণ মানুষের অর্থে তৈরি করা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তখন দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না।

নূতন বিশ্বে দক্ষ জনশক্তি হওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যদি একাধিক বিষয়ে major ও minor দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে চাকরির বাজারের জন্যে প্রস্তুত করতে পারে তাহলে আমাদেরকেও সেটা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একটি ছেলে কিংবা মেয়ে যদি জানে যে তাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিভাগে আটকা পড়ে থাকতে হবে না, তারা যে বিভাগে ডিগ্রি নিতে চায় সেই বিভাগেই ডিগ্রী নিতে পারবে তাহলে উচ্চ শিক্ষার জগতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে যাবে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সেটি ইচ্ছে করলে করতে পারি আরও সুন্দরভাবে। তার জন্যে প্রথমে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এটি বিষয়ে নজর দিতে হবে– সেটি হচ্ছে গবেষণা।

৪.

বাংলাদেশে প্রায় ষোল কোটি মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনো একশ অতিক্রম করে নি কিন্তু খুবই লজ্জার কথা এই দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই কিন্তু সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রকম জ্ঞান বিতরণের জায়গা ঠিক সেরকম জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা। আমরা জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছি কিন্তু খুব সংকোচের সাথে আমাদের স্বীকার করতেই হবে আমরা কিন্তু এখনো জ্ঞান সৃষ্টি শুরু করতে পারিনি। জ্ঞান সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়োজন গবেষণার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেই গবেষণা হতে পারে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে– যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মাস্টার্স এবং পিএইচডি করবে। মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি করার সময় শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হয় তখন

www.BanglaBook.org

কোনো কোর্স বা পরীক্ষার চাপ থাকে না, সবাই গবেষণায় সময় দেয় এবং সব সময়েই আগের ছাত্রের সাথে পরের ছাত্রের একটা সেতুবন্ধন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো যে বিষয়ে গবেষণা করে সে বিষয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরী হয় এবং গবেষনালব্ধ জ্ঞানটুকু সেখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রেরা ধারণ করেন! সেই গবেষণার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হিসেবে তাদেরকে মাস্টার্স পিএইচডি দেয়া হয়।

সেরকম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারলে একটি বিভাগ পরিচিত হয় সেই বিভাগের শিক্ষক এবং তাদের গ্র্যাজুয়েট স্কুলের মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে– তাদের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নয়। তার কারণ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট বিভাগে আবদ্ধ রাখতে চাই না– তারা হবে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ছাত্র। যে ছাত্রটি পদার্থ বিজ্ঞানের কোর্স নিচ্ছে সে একই সাথে নাট্যকলার কোর্স নিচ্ছে। যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্স নিচ্ছে সে হয়তো সংগীতের কোর্সও নিচ্ছে– কাজেই তাদেরকে কেন মিছিমিছি একটা মাত্র বিভাগের ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত করব? তারা হবে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বড় জোর প্রথম দুই বৎসর শেষ হওয়ার পর যখন তাদের major নির্দিষ্ট হবে তখন হয়তো হিসেব রাখার জন্যে তাদের বিভাগটি নির্দিষ্ট করে শুরু করা যেতে পারে।

৫.

যদি আমরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের বিভাগের ছাত্র না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই তাহলে সেটি কেমন করে করা হবে? এ কথাতো সত্যি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ ত্রিশ হাজার ছাত্রছাত্রী কোনো বিভাগের নয়– তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে কী ভাবে? তাদের নাম রোল নম্বর লেখা হবে কোন খাতায়? বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শুরুতে তাদের ভর্তি করা হবে তাদের পছন্দের ফ্যাকাল্টিতে। সেখানে অবশ্যি আমাদের কিছু বিষয় চাপিয়ে দেয়ার অধিকার আছে, যে ছাত্রটি স্কুল কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে আসে নি তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। কমার্সের ছাত্রটিকেও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাথে সাথে কিংবা ভর্তি হবার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট থেকে জেনে যাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি

www.BanglaBook.org

পেতে হলে তার কোন কোন বিষয়ে কোর্স নিতে হবে। একটা উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডিগ্রি নিতে হলে কী কী কোর্স নিতে হবে দেখানো হলো- এটি একটি উদারহণ মাত্র, এটা কিন্তু চূড়ান্ত কিছু নয়, ক্রেডিটের কিছু কম বেশি অবশ্যই হতে পারে।

১. ইংরেজি ভাষা:	০৬ ক্রেডিট
২. বাংলাদেশ স্টাডিজ	০৩ ক্রেডিট
৩. গণিত	১২ ক্রেডিট
৪. পরিসংখ্যান	০৪ ক্রেডিট
৫. পদার্থ বিজ্ঞান	০৮ ক্রেডিট
৬. রসায়ন	০৪ ক্রেডিট
৭. কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ	০৬ ক্রেডিট
৮. ইলেকট্রনিক্স	০৬ ক্রেডিট
৯. টেকনিক্যাল রাইটিং	০৩ ক্রেডিট
১০. সামাজিক বিজ্ঞান	১২ ক্রেডিট
মোট	৬৪ ক্রেডিট

উপরের কোর্সগুলো বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে প্রযোজ্য– এই কোর্সগুলো কখন কীভাবে নেবে সেগুলো ছাত্রছাত্রীরাই ঠিক করবে। সমাজবিজ্ঞান বা অন্য ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও এ ধরনের কোর্স নির্দিষ্ট করা সম্ভব। আমি যেহেতু সমাজ বিজ্ঞানের মানুষ নই তাই সেটা বের করার চেষ্টা করি নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোর্সগুলো দেবে এবং ছাত্রছাত্রীরা কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে সেগুলো নেবে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখে আগে থেকে যথেষ্ট সংখ্যাক কোর্স দেয়া হবে যেন সবাই সব কোর্স নিতে পারে। শুধু তাই নয় প্রতি গ্রুপেই শুধু মাত্র একই কোর্স থাকবে না– একই ধরণের বেশ কিছু কোর্স থাকতে পারে যেখান থেকে সে তার পছন্দের কোর্স বেছে নিবে। যেখানে একাধিক কোর্স নেওয়ার ব্যাপার আছে সেখানে কোর্সের ধারাবাহিকতা থাকতে পারে এবং আগের কোর্সটি নেয়ার আগে পরের কোর্সটি নিতে পারবে না এরকম নিয়মও থাকতে পারে তবে সেগুলো হচ্ছে খুটিনাটি, এই লেখায় সেদিকে যাবার সুযোগ বা প্রয়োজন কোনটাই নেই।

উপরের যে উদাহরণটি দেয়া হয়েছে সেটা শেষ করতে একজন শিক্ষার্থীর চার সেমিস্টার বা দুই বছর লেগে যাবে। এই দুই বছর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.BanglaBook.org

পরিবেশে থেকেছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা সেমিনার সামাজিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছে। কাজেই কোর্সগুলো নেয়ার সময় সে নিজেই আবিষ্কার করবে তার কোন বিষয়টি প্রিয় এবং কোন বিষয়ে সে তার ডিগ্রি পেতে চায়। ডিগ্রি নেবার জন্যে তাকে তার নিজস্ব বিভাগের কোর্স নিতে হবে। এ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু বিভাগে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে– এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তাদের প্রথম দুই বছরের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে। যারা ভালো করেছে তারা আগে সুযোগ পাবে।

আমরা মোটামুটি ভাবে বলতে পারি তার নিজস্ব বিষয়ে ৬০ ক্রেডিট্স নিতে হবে এবং সেটা এভাবে ভাগ করা সম্ভব:

নিজের বিভাগের কোর্স :

বাধ্যতামূলক	৩৬ ক্রেডিট
ঐচ্ছিক	১৮ ক্রেডিট
প্রজেক্ট	০৬ ক্রেডিট

বাধ্যতামূলক কোর্সগুলো সেই বিভাগের জন্যে সুনির্দিষ্ট এবং এই কোর্সগুলো না নিয়ে কেউ সেই বিভাগের ডিগ্রিধারী হিসেবে বের হতে পারবে না। ঐচ্ছিক ১৮ ক্রেডিটও একই বিভাগের কোর্স কিন্তু সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের বেছে নেয়ার সুযোগ থাকবে। জ্ঞানের যে বিশাল বিকাশ ঘটেছে সেখানে যেরকম বৈচিত্র সেরকম ব্যপ্তি। কাজেই একজন শিক্ষার্থী যেন নিজের পছন্দের কোর্স নিতে পারে তাকে সেই সুযোগটি দেয়া হবে।

এতোক্ষণ পর্যন্ত যে ক্রেডিটগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে তার নির্দিষ্ট বিষয়ের কোর্স– কিন্তু আমরা কোনোভাবেই একজন ছাত্রকে শুধুমাত্র তার বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। নূতন বিশ্বে কেউ কিন্তু সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আটকে থাকে না। কাজেই আমরাও ছাত্রছাত্রীদের এখানে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য চমকপ্রদ কোর্স থাকতে পারে, ফটোগ্রাফী, নাট্যকলা, আবৃত্তি, কারাটে থেকে শুরু করে জেন্ডার স্টাডিজ, অপরাধতত্ত্ব, যুদ্ধাপরাধ কোনো কিছুর মাঝে সেগুলো সীমাবদ্ধ নেই। লেখাপড়া থেকে চাপ সরিয়ে নেয়ার জন্য এই কোর্সগুলোকে শুধুমাত্র পাশ ফেল হিসেবে রাখা হবে যেন বিষয়টা তারা উপভোগ করতে পারে। কাজেই তাদের সেরকম কিছু কোর্স নিতে পারে এবং আমরা লিখতে পারি:

www.BanglaBook.org

বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় পাশ ফেল গ্রেডবিহীন ২০ ক্রেডিট

একজন ছাত্র বা ছাত্রী যদি অন্যান্য কোর্সের সাথে উপরের কোর্সগুলোও সম্পন্ন করতে পারে তাহলে তাকে সেই বিভাগে ডিগ্রি দেয়া হবে।

এখন আসছে minor ডিগ্রীর বিষয়টি। প্রত্যেকটি বিভাগেই আগে থেকে ঘোষনা করতে পারে– নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তার শিক্ষাগত ভিত্তি থাকলে সে সেই বিভাগে থেকে একটা minor নিতে পারবে। আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কোর্সগুলো বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেকোন ছাত্র বা ছাত্রীকে যদি কম্পিউটার সায়েন্সের ১৮ ক্রেডিটের বিশেষ কিছু কোর্স দেয়া যায় তাহলে তাকে minor ডিগ্রি দেয়া উচিৎ কারণ এই বাড়তি জ্ঞানটুকু নিয়ে সে ইচ্ছে করলে যে কোনো সফ্‌টওয়্যার কোম্পানীতে ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারবে। কাজেই মোটামুটি ভাবে এভাবে বলা যায়:

minor ডিগ্রি: নির্দিষ্ট বিভাগের নির্দিষ্ট করে দেয়া কোর্স ১৮ ক্রেডিট

এই বিষয়টি চালু করা হলে চাকরির বাজারের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো বিভাগের কোনো কোনো কোর্সেও অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর আগ্রহ জন্মে যেতে পারে। সেটাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্যে সেই কোর্সে রেজিস্ট্রেশনের অগ্রাধিকার দেয়া হবে তার সামগ্রিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে। যারা minor নিতে চায় তারা হয়তো বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়– পাশ ফল ২০ ক্রেডিটের জায়গায় এই কোর্সগুলো নেবে। মজার কোর্স নেয়ার আনন্দটুকুর পরিবর্তে একটি নূতন বিষয়ে minor করার গৌরব অর্জন করবে।

দ্বিতীয় major নিতে হলে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রয়োজনীয় আট সেমিস্টার থেকে বেশি সময় থাকতে হবে এবং যদি minor ডিগ্রি নেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় একটি major নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে। তারপরেও সেটি চালু রাখা প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখার জন্যে। এই মুহূর্তে যেটি বলা সম্ভব সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় major হয়তো সকল বিভাগের জন্যে দেয়া সম্ভব হবে না– একজন হয়তো কাছাকাছি দুটি বিভাগে দ্বিতীয় major নিতে পারবে। খুব বেশি গভীরে না গিয়েই অনুমান করা যায় নিচের বিষয়গুলোর একটিতে থাকলে অন্যটিতে দ্বিতীয় major নেয়া সম্ভব:

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদার্থ বিজ্ঞান	:	গণিত
গণিত	:	পরিসংখ্যান
কম্পিউটার সায়েন্স	:	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
সমাজ বিজ্ঞান	:	নৃবিজ্ঞান
		ইত্যাদি

যে সকল বিভাগ অন্য বিভাগ থেকে দ্বিতীয় major নিতে অনুমতি দেবে তাদেরকে আগে থেকেই পুরো বিষয়টি ঘোষণা করে দিতে হবে।

৬.

এ ধরনের একটা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্যে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন হবে– তার মাঝে প্রথম হচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য কিছু কিছু সৌভাগ্যবান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। বিশেষ করে নূতন যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে শিক্ষকদের অবস্থা ভয়াবহ ভাবে কম। গত জোট সরকারের আমলে যেভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে প্রায় সেরকম উৎসাহে এই সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। বিষয়টা চমৎকার একটি বিষয় হতে পারত যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঠিক অবকাঠামো থাকত, যথেষ্ট শিক্ষক থাকত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হতো। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুটা যদি ভালো না হয় তাহলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির চমৎকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ একেবারেই কমে যায়।

শিক্ষকদের অভাব মেটানোর একটা উপায় হচ্ছে– টিচিং এসিস্টেন্ট। যেখানে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ঠিকভাবে চালু হয়েছে সেখানে মাস্টার্স পিএইচডি এর ছাত্রছাত্রীদের টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা পরীক্ষার দায়িত্ব ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের উপর চাপ একটু কমাতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং যথেষ্ট পরিমাণ টিচিং এসিস্টেন্টের পর আসবে পুরো প্রোগ্রামটি নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি। সেটি করা সম্ভব যদি পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে কম্পিউটারায়ন করা হয়। ছাত্রছাত্রীর ডাটাবেস, কে কোন কোর্স নিয়েছে, ফলাফল কী, এর পর কোন কোর্স নেবে, কে কোন কোর্স

www.BanglaBook.org

রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বিষয়গুলো মূল ডাটাবেসে থাকবে এবং সবাই সেটি ব্যবহার করতে পারবে। সাধারণভাবে বলা যায় এ ধরণের সফ্‌টওয়্যার জটিল এবং খরচ সাপেক্ষ এবং চট করে কেউ এটা করে ফেলতে পারবে না। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে সাম্প্রতিক কালে উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিষয়গুলোর জন্যে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে সবার ব্যবহারের উপযোগী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কিছু সফটওয়ার তৈরি করা হবে।

দেশের পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার নিজস্ব একটা পদ্ধতি দাড়িয়ে গেছে কাজেই সেখানে এধরনের একটা নূতন পদ্ধতি সহজে শুরু করা সম্ভব নয়। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হয়তো সম্ভব।

আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের বিশাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার জগৎটুকু নেহায়েতই নিরানন্দ এবং উৎসাহহীন। তাদের এই জগৎটিকে আনন্দময় এবং উৎসাহে ভরপুর করে তোলার দায়িত্ব আমাদের– ঠিক কীভাবে সেটা করা হবে হয়তো আমরা এখনো জানি না কিন্তু নূতন কিছু করতে হবে সে বিষয়ে কারো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারক বক্তৃতায় পঠিত, ৯ এপ্রিল ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমরণ অনশন

আমি যতটুক জানি হার্ভার্ডকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুপুর বেলা আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বসে অন্যমনস্কভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষকদের আসা যাওয়া দেখছিলাম। আমার মনটি ভালো ছিল না– আমি যখনই পৃথিবীর সেরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি, তখনই বুকের ভেতর একধরনের বেদনা অনুভব করি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা কত ধরনের সুযোগের মাঝে লেখাপড়া করে– আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কিছুই দিতে পারি না। আজকে আমার মনটা একটু বেশি খারাপ ছিল, কারণ সকালে কম্পিউটার খুলে ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটা ই-মেইল পেয়েছি– তারা সবাই আমরণ অনশন করছে। আমাকে বলেছে, আমি যেন কোনভাবে তাদের পাশে দাঁড়াই। আমি হার্ভার্ডের চত্বরে বসে হাসিখুশি ছাত্রছাত্রীদের ছুটোছুটি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, এদের সম্ভবত আমি কোনো দিন বোঝাতেও পারব না যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাঝে আমরণ অনশন করতে হয়– আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও একবার করেছিল। যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেই আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলের নাম দেওয়া হয়েছিল শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, যিনি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবি করে এই দেশের মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি গিয়েছিলেন এবং সে কারণে যুদ্ধাপরাধীরা সেটা মেনে নিতে পারেনি এবং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করার জন্য ঢাকার শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেছিল।

আমি আমরণ অনশন কথাটিকে খুব ভয় পাই। কারণ, আমি জানি, সেটি

www.BanglaBook.org

শুরু করার পর প্রথম দু-এক দিন ভয়ংকর ক্ষুধা পায়। তারপর ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং যারা অনশন করে, তাদের মধ্যে একধরনের তীব্র অভিমান ও ক্ষোভের জন্ম হয় এবং তখন সবাই মিলে হঠাৎ করে সত্যিই বিশ্বাস করতে থাকে যে এই জীবন রেখে লাভ নেই। তাদের শরীর ভেঙে পড়ে এবং কারও কারও শরীরে পানির অভাব হয়ে তীব্র খিঁচুনি হতে থাকে, সেই দৃশ্যগুলো খুব ভয়ংকর। শক্ত মানুষেরা সেগুলো সহ্য করতে পারে, আমি নেহাতই দুর্বল চরিত্রের মানুষ, আমি সহ্য করতে পারি না। বিদেশের মাটিতে বসে আমি খুব ভয়ে ভয়ে খবরের কাগজগুলো দেখি– ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কেমন আছে দেখার চেষ্টা করি।

যখন এই গোলমালটা শুরু হয়, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের কিছু ছাত্র সিলেটে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। খবরের কাগজে দেখেছি, সেখানে গোলমাল হচ্ছে এবং তারা তখন আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছে। কোনো একটা বিচিত্র কারণে তাদের ধারণা হয়েছিল, তাদের নিজস্ব একটি বিষয়ে আমি নাক গলালেই সমস্যার একটি সমাধান হবে। আমি তাদের খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, এই দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত, সবাই নিজেদের নিয়মকানুন দিয়ে চলে। আমি ভিন্ন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোনভাবেই অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি ব্যাপারে নাক গলাতে পারি না। আমি কখনোই এটা করিনি, করার কোনো সুযোগ নেই, অধিকার নেই। আমি ছাত্রদের বলেছিলাম, তাদেরকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টার নিস্পত্তি করতে হবে। ছাত্ররা বেশ হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

এরপর আমি খবরের কাগজে তাদের খবর পেয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গোলমালের কারণে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া এই দেশের খুব পরিচিত একটা ঘটনা। কিন্তু ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটি ঘটেছে, সেটি খুবই বিচিত্র একটি ঘটনা– বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করছে, শুধু একটি বিভাগকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং তারা তাদের দাবি আদায় করার জন্য নানা ধরনের আন্দোলন করে যাচ্ছে। বিষয়টি আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়-সুলভ মনে হয়নি। আমি নিজে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের তাণ্ডব কোন পর্যায়ে যেতে পারে, আমি সেটা দেখে অভ্যস্ত। আমাদের লাইব্রেরির নিচতলায় কাচের দেয়ালে ঘেরা একটি কম্পিউটার ল্যাব আছে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেট

www.BanglaBook.org

ব্রাউজ করে। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ মারামারি করে একদিন আমাদের সেই ল্যাবটি ভেঙে চুরমার করে দিল– আমার এত মন খারাপ হয়েছিল যে আমি সেটা কোনো দিন দেখতেও যাইনি। এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা বলা যাবে, অনেক রক্তপাতের কথা বলা যাবে, কিন্তু তার পরেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দিনের জন্যও ক্লাস বন্ধ থাকেনি। এর সবকিছু সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র কারণে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কখনোই ছাত্রদের নিজেদের প্রতিপক্ষ ভাবেননি। তাদেরকে অর্বাচীন ভেবেছেন, দায়িত্বহীন ভেবেছেন, অপরিপক্ক বালখিল্য ভেবেছেন কিন্তু কথা বলার অযোগ্য শত্রুগোষ্ঠী ভাবেননি। তাই কখনোই তাদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হয়নি এবং এমন কোনো সমস্যার জন্ম হয়নি, যেটা কথা বলে সমাধান করা যায়নি।

আমার মনে হয়েছে, ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুটি ভিন্ন মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে এবং একদল অন্য দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করছে। যে সমস্যাটি কথা বলে বা আলোচনা করে সমাধান করা যেত, সেটি সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়ায়– যেটাকে সাদা কথায় বলা হয় আমরণ অনশন। কম বয়সী আবেগপ্রবণ ছেলেমেয়েরা যদি হঠাৎ করে এ অনশন কঠিনভাবে গ্রহণ করে ফেলে, সেখান থেকে বের হওয়ার সহজ কোনো রাস্তা আমার জানা নেই।

যে বিষয়টি নিয়ে সবকিছুর সূত্রপাত, আমি সেটা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই, এ দেশের মানুষের এগুলো একটু জানা প্রয়োজন। আমি যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন আমাকে যে বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়, তার নাম ছিল ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ। কয়েক বছর পর সব ছাত্রছাত্রী একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল– তারা আমাকে জানাল, তাদের খুব ইচ্ছে বিভাগটিকে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পরিবর্তন করে এর নাম করা হোক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। কেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ করতে হবে, তার পক্ষে তারা নানা ধরনের কারণ দেখিয়েছিল। এত দিন পরে আমার সেগুলো মনে নেই, শুধু একজন ছাত্রের ঠাট্টা করে বলা কথাটি মনে আছে, সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, স্যার, ইঞ্জিনিয়ার না–হলে মেয়ের বাবারা বিয়ে দিতে চায় না।

আমার ছাত্রদের বিয়ের জন্য নয়, তাদের বক্তব্যের কারণে আমি বিষয়টি বিবেচনা করেছিলাম, সিলেবাসটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলাম। তারা মতামত দিয়েছিলেন, সেই

www.BanglaBook.org

মতামতের ভিত্তিতে সিলেবাসের পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি বিষয়টি তখন একাডেমিক কাউন্সিলে নিয়ে গিয়েছিলাম। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা সেটা আলোচনা করে, আমার বিভাগটির নাম পরিবর্তন করে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক ছাড়াই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এধরনের যুক্তি দেওয়া যেত– কেউ দেয়নি। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাস করে এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শুধু আমাদের বিভাগ নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেকগুলো বিভাগের নাম এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রতিবারই একাডেমিক কাউন্সিল সেটা করে দিয়েছে শুধু ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তানেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে যখন চাকরির বাজারে ঢুকবে, তখন শুধু একটা নামের পরিবর্তনের জন্য যদি তাদের সামনে বিশাল একটু সুযোগ চলে আসে, তাহলে কেন সেটি করা হবে না? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ যে বিভাগের নামের পরিবর্তন হয়েছে, সেটি হচ্ছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টি টেকনোলজি– ঠিক যে পরিবর্তনের জন্য ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে যাচ্ছে, হুবহু এই পরিবর্তনটি কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে।

এ কথাটি কেউ অস্বীকার করবে না যে একটি বিভাগের কী নাম হবে, সেটি কখনোই কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আবদার শুনে ঠিক করা হবে না। কিন্তু এ কথাটিও মেনে নিতে হবে, তাদের কথাগুলো কাউকে না কাউকে শুনতে হবে। যদি তাদের কথায় যুক্তি থাকে, তাহলে সেটা বিবেচনা করার সৎসাহস থাকতে হবে। ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা পুরোপুরি তাদের ব্যাপার। তাদের সিলেবাসে যেটা আছে, সেটা দিয়ে তারা হয়তো আসলেই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পেতে পারে না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দিতে হলে কী কী পরিবর্তিন আনতে হবে এবং সেই পরিবর্তন এনে ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি এক-দুই সেমিস্টার রেখে নতুন কোর্স পড়িয়ে নতুন ডিগ্রি দেওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক ঘটনা নয়। অন্তত আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব সতর্কভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে এটা একাধিকবার করা হয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি, ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে– এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কিছু হতে পারে না। আমি নিজে একজন শিক্ষক। আমি জানি, তাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে, শাস্তি দিয়ে,

www.BanglaBook.org

ভয়ভীতি দেখিয়ে যেটুকু অর্জন করা সম্ভব, তার থেকে শত গুণ বেশি অর্জন করা সম্ভব, তাদের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় একটি-দুটি কথা বলে। আমি খুব আশা করে আছি, শিক্ষকদের কেউ না কেউ তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা শুনবেন, মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবেন। সমস্যাটির সমাধান করবেন।

কথা বলে সমাধান করা যায় না– এ রকম কোনো সমস্যা পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মে ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাত্র এক হাজার পিএইচডি

মানুষের চরিত্রে যে কয়টি দোষ থাকা সম্ভব, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপটি মনে হয় হিংসা– তার কারণ এটাকে নিজের ভেতর থেকে সহজে দূর করা যায় না। আজ (৩ জুন) সকালে এমআইটির (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি) সব পিএইচডি শিক্ষার্থীর হুড পরানোর উৎসবে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রায় সাড়ে ৪০০ শিক্ষার্থী এই বছর এমআইটি থেকে ডক্টরেট পেয়েছে, আগামীকাল (৪জুন) তাদের সমাবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আর নির্দিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পিএইচডি পাওয়া প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নিজ হাতে তাদের হুড পরিয়ে দিয়েছেন, আগামীকাল তারা সেটি পরে সমাবর্তনে যাবে। এমআইটির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০ হাজার, তাদের ভেতর থেকে বছরে সাড়ে ৪০০ ডক্টরেট বের হয়। আমি যে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক সেই বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার, আমরা বছরে নিয়মিতভাবে একজন ডক্টরেট বের করতে পারি না। কাজেই এমআইটির আনন্দোচ্ছল অনুষ্ঠানে বসে বসে আমি যদি হিংসায় জর্জরিত হই, কেউ নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দিতে পারবে না!

আমি জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা নেহাতই গাধামো (বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার আগে আমি এই দেশে ১৮ বছর কাটিয়ে গেছি। কাজেই এই বিষয়টি আমার থেকে ভালো করে আর কে জানে?)। যে জিমনেসিয়ামে বসে আমি অনুষ্ঠানটি দেখেছি, বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সে রকম একটি জিমনেসিয়াম পর্যন্ত নেই– কাজেই গবেষণার সঙ্গে তুলনা করি কেমন করে? কিন্তু কেউ যেন আমাকে ভুল না বোঝে– আমি নির্বোধ নই– এমআইটির সঙ্গে

www.BanglaBook.org

তুলনা করে আমি হিংসায় জর্জরিত হয়েছি সত্য কিন্তু আমি যন্ত্রণায় কাতর হয়েছি অন্য কারণে! কারণটি ব্যাখ্যা করলে সবাই বিষয়টি বুঝতে পারবে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) সিলেটে এবং মাত্র কিছুদিন আগে আমরা আবিষ্কার করেছি, আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি আসলে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়– সেটি পড়েছে ভারতে। বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। সেই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরও বেশ কয়েকজন অধ্যাপক কর্মকর্তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে শিক্ষা গবেষণা বিনিময়ের একটা চুক্তিও স্বাক্ষর করে গেছেন। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, তাঁরা সবাই বাঙালি– কাজেই দীর্ঘ সময় আমরা খুব সহজভাবে কথা বলতে পেরেছি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে ভারতের এই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের পরে যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পিএইচডি শিক্ষার্থী একজনও নেই (বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি বিভাগে মাত্র কাজ শুরু হয়েছে) অথচ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০০। হ্যাঁ, আমি লিখতে গিয়ে ভুলে একটা শূন্য বেশি দিয়ে দিইনি– আসলেই এক হাজার ২০০।

প্রায় একই সঙ্গে তৈরি হওয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে নিয়মিত পিএইচডি একজনও নেই, অন্যটিতে পিএইচডির সংখ্যা এক হাজার ২০০। তার পেছনের কারণটিও কেউ কি বলতে পারবে? আমি জানি, এই দেশের খবরের কাগজ, মিডিয়া এবং আমলারা আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুই চোখে দেখতে পারে না। তাঁরা নিশ্চয়ই ভুরু নাচিয়ে বলেছেন, 'কারণ খুবই সহজ! ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা লেখাপড়া করেন, গবেষণা করেন! আমাদের শিক্ষকেরা দলাদলি করেন, লাল-নীল রাজনীতি করেন! সেই জন্য এই অবস্থা!

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি, তাই আমি সব সময়েই আমাদের সমালোচনাটি মাথা নিচু করে মেনে নিই, কিন্তু এবারে সবিনয় প্রকৃত তথ্যটি দিতে চাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পিএইচডি একজনও নেই, কারণ সরকার থেকে এ জন্য একটি কানাকড়িও দেওয়া হয় না। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ২০০, কারণ তাদের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে মাসে ১২ হাজার রুপি করে বৃত্তি দেওয়া হয়। যদি আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এ রকম বৃত্তি দিতে পারতাম, তাহলে আমরাও এ রকম পিএইচডি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিক্ষার্থী পেতে পারতাম। (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার মনোন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রজেক্ট চালু হয়েছে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রজেক্টের আওতায় কিছু টাকা-পয়সা পেয়েছে, তারা দু-একজন পিএইচডি ছাত্রছাত্রী নিতে পেরেছে– কিন্তু আমি আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এটা নিয়মিত কিছু নয়। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা)।

২.

আমি সুযোগ পেলেই সবাইকে মনে করিয়ে দিই, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠেনি। তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব দুটি, এক: জ্ঞান বিতরণ করা, দুই: জ্ঞান সৃষ্টি করা। এই দুটি মূল দায়িত্বের একটি আমরা হয়তো জোড়াতালি দিয়ে পালন করছি, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারছি না। জ্ঞান সৃষ্টি করতে হলে গবেষণা করতে হয় আর সত্যিকার অর্থে গবেষণা করার জন্য দরকার মাস্টার্স এবং বিশেষ করে, পিএইচডি ছাত্রছাত্রী। কাজেই কোন বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু জ্ঞান সৃষ্টি করছে, তার সবচেয়ে সহজ হিসাব হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ছাত্রছাত্রী নেই, বুঝে নিতে হবে সেখানে গবেষণাও নেই! (তার পরও আমাদের দেশে প্রায় নিয়মিত ভাবে কিছু কনফারেন্স হয়, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকের গবেষণা পেপার প্রকাশ করেন– দেশের তুলনায় তার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু তার পরও যাঁরা এই ধারাটি কষ্ট করে ধরে রেখেছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।)

৩.

কেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এক হাজার ২০০ পিএইচডি ছাত্রছাত্রীকে মাসে ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি দিতে পারে এবং আমরা একজনকেও পারি না, তার কারণটি কি কেউ জানতে চান? কারণটি খুবই সহজ, ভারত শিক্ষার গুরুত্বটি ধরতে পেরেছে। তারা শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করতে পারছে। আমরা এখনো শিক্ষার গুরুত্বটি ধরতে পারিনি– আমরা তাই শিক্ষার জন্য টাকা খরচ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে শিখিনি। পৃথিবীর সব দেশ মিলে ঠিক করেছিল, পৃথিবীটাকে একটা সুন্দর জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে, এই প্রতিটি দেশ অঙ্গীকার করেছিল, তারা তাদের বাজেটের ২০ শতাংশ অথবা জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষার পেছনে খরচ করবে। ডাকার চুক্তি নামে সেই চুক্তিতে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করে এসেছিল, কাজেই বাংলাদেশেরও জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষার জন্য খরচ করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ খরচ করে মাত্র ২ দশমিক ৪ ভাগ। ভারত খরচ করে শতকরা ৪ভাগ। তাই তাদের ছোট একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো সময় এক হাজার ২০০ পিএইচডি শিক্ষার্থী থাকে– আমাদের একজনও থাকে না।

কেউ যেন মনে না করে, আমি এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করার জন্য বসেছি। আমাদের অর্জন কিন্তু কম নয়। অর্থনৈতিক ভিত্তি তুলনা করলে ভারত থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে, তাদের জিএনপি ১১৭০ ডলার, বাংলাদেশে মাত্র ৫৯০ ডলার। কিন্তু অমর্ত্য সেন তাঁর একটি লেখায় বাংলাদেশ আর ভারত তুলনা করে দেখিয়েছেন (Quality of life: India Vs. China, The New York Review of Books, May 12, 2011) বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেশি (৬৬.৯ বছর বনাম ৬৪.৪ বছর) পাঁচ বছর থেকে কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কম (৫.২ শতাংশ বনাম ৬.৬ শতাংশ) ডিপিটি ভ্যাকসিন দেওয়া শিশু বেশি (৯৪ শতাংশ বনাম ৬৬ শতাংশ)। অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা কম (৪১.৩ শতাংশ বনাম ৪৩.৫ শতাংশ), জন্মহার কম (২.৩ বনাম ২.৭), স্কুলের সময় বেশি (৪.৮ বছর বনাম ৪.৪ বছর)। পুরুষের সাক্ষরতা ভারতে বেশি হলেও নারী সাক্ষরতায় বাংলাদেশ এগিয়ে। অমর্ত্য সেন লক্ষ করেছেন যে কম বয়সী মেয়েরা বাংলাদেশে লেখাপড়ায় ছেলেদেরও ডিঙিয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, বাংলাদেশের উন্নতির পেছনে আমাদের এই মেয়েরা অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। জিএনপি ভারতের অর্ধেক হওয়ার পরও বাংলাদেশের এ রকম অভাবনীয় সাফল্যের জন্য অমর্ত্য সেন একদিকে যে রকম সরকারের ভূমিকার কথা বলেছেন, ঠিক সে রকম গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানের সৃজনশীল ভূমিকার কথা বলেছেন। (না, আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে এই দেশে কীভাবে অসম্মান করেছি, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো সেটা ভুলতে পারি না!)

অমর্ত্য সেন অনেকগুলো বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি

www.BanglaBook.org

না দেখালেও আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি যে দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমরা আরও কিছু চাই। খুব সহজভাবে বলা যায়, ১৬ কোটি মানুষের দেশে প্রতিবছর অন্তত কয়েক হাজার পিএইচডি বের হওয়া দরকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মোটামুটি একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে, কিন্তু এই দেশের উচ্চশিক্ষা আধুনিক পৃথিবীর তুলনায় মোটামুটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে পড়ে আছে। বাংলাদেশকে যদি আধুনিক দেশে তৈরি করতে হয়, তাহলে উচ্চশিক্ষাকে আধুনিক করতে হবে আর সেটা করা সম্ভব, যদি আমরা প্রতি বছর অন্তত কয়েক হাজার পিএইচডি বের করতে পারি।

৪.

আমি ছোট একটা হিসাব করে দেখেছি, একজন ছাত্রকে যদি পিএইচডি করতে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতি মাসে আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া দরকার (ভারতে ১২ হাজার রুপির তুলনায় সেটা যথেষ্ট কম কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে এর থেকে বেশি হয়তো এ মুহূর্তে বিবেচনা করা সম্ভব নয়)। একজন শিক্ষার্থীর পিএইচডি করতে কমপক্ষে চার বছর লেগে যায়, কাজেই মোটামুটি ১০লাখ টাকা খরচ করা হলে এই দেশে একজন পিএইচডি তৈরি করা সম্ভব। গবেষণার একটি খরচ আছে, আমি ধরে নিচ্ছি শিক্ষার্থীর মাসিক বৃত্তি ছাড়াও গবেষণার এই খরচটিও এখান থেকে দেওয়া হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে খরচ আরও অনেক বেশি। আমি ধরে নিচ্ছি, প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খানিকটা অবকাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে, তারা সেটা ব্যবহার করতে পারবে।

কাজেই খুব সহজ একটা হিসাব, প্রতিবছর এক হাজার পিএইচডি বের করতে হলে সরকারকে ১০০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। আমি খবরের কাগজে দেখেছি, এই বছরের বাজেট এক লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা– সেখান থেকে ১০০ কোটি টাকা আলাদা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া কি কঠিন কোনো ব্যাপার? আমরা যদি এক হাজার পিএইচডি বের করতে পারি, সেটা এই দেশের জন্য কতবড় একটা ব্যাপার হতে পারে, কেউ কি চিন্তা করে দেখেছে? প্রথমত, তারা আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি স্কুলের সত্যিকারের শিক্ষক হতে পারবে। পিএইচডি করার সময় তারা যে গবেষণার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদ্ধতিটি শিখে নেবে, সেই জ্ঞানটুকু তারা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা পিএইচডি করবে, তারা সেখানে যেহেতু সার্বক্ষণিক থাকবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে– লেখাপড়ার মান বেড়ে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করবে সেগুলো হবে আমাদের সত্যিকারের সম্পদ।

কী কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যায়, সেটা চিন্তা করতেই আমার জিবে পানি এসে যায়। সবার আগে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারি, আমাদের ইতিহাসের এত গৌরবোজ্জ্বল একটি বিষয় কিন্তু আমরা কি সেটা নিয়ে সত্যিকারের গবেষণা করেছি? পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে সেই জ্ঞান কি সঞ্চিত আছে? আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-প্রক্রিয়া শুরু করেছি? সবাই টের পাচ্ছি যুদ্ধাপরাধীদের অপকর্মের সঠিক তালিকা এখনো আমাদের হাতে নেই। আমরা যদি সত্যিকারভাবে গবেষণা করতে পারতাম, মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই যদি হাজার খানেক পিএইচডি থাকত, তাহলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটি কি একশভাগ সহজ হয়ে যেত না? বঙ্গবন্ধুর মতো বর্ণাঢ্য জীবন কজনের আছে আমরা কি তাঁকে নিয়েই গবেষণা করেছি? জনপ্রিয় বই খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু গবেষণা কি পাওয়া যায়? পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা আমাদের দেশের নেতাদের নাম কেন খুঁজে পাই না। একাত্তরে তাজউদ্দীন আহমেদ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর ওপর কি গবেষণা করা হয়েছে? স্বাধীনতার পর কেমন করে পঁচাত্তরে দেশ উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল, সেটা নিয়ে এই দেশে কয়টি নির্মোহ গবেষণা হয়েছে?

এ বছর রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও আমরা কি এই দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর কয়েক ডজন পিএইচডি শুরু করতে পারি না? আমি সিলেটে থাকি, বাউলসম্রাট শাহ আবদুল করিমকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি– তাঁর ওপর কি কয়েকটি পিএইচডি করা যায় না?

আমাদের দেশের অনেক সমস্যা আমাদের একেবারেই নিজস্ব, পৃথিবীর অন্য কেউ সেই সমস্যার সমাধান করে দেবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে পারে না? সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, অত্যন্ত রুটিন ব্যাপারের সমাধান খুঁজতে গিয়ে অনেক বিষয় বের হয়ে আসে, যেটা পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারে মাথা উঁচু করে জমা দেওয়া যায়। বাংলা ভাষাকে আমরা এখনো কম্পিউটারে পুরোপুরি উপস্থাপন করতে

www.BanglaBook.org

পারিনি– এটাকে সত্যিকার অর্থে কম্পিউটারে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া শুরু করলে কত বিচিত্র গাণিতিক বিষয় বের হয়ে আসবে, কত নতুন অ্যালগরিদম জন্ম নেবে, আমরা কি সেটা চিন্তা করে দেখেছি? বিজ্ঞান, যার প্রযুক্তিতে আমাদের অবদান সবচেয়ে কম, কিন্তু দেশকে যদি সামনে নিতে হয়, আমাদের যেভাবে হোক এখানে অবদান রাখতে হবে– সেটা সম্ভব শুধু এই ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করে। একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এ দেশে কি পাটের জিনোম বের করিনি?

আর কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের দেশের বাজেট দেওয়া হবে। সেই বাজেটে এক হাজার পিএইচডি তৈরি করার জন্য কি ১০০কোটি টাকা আলাদা করে রাখা সম্ভব?

আসামের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি এক হাজার ২০০ পিএইচডি শিক্ষার্থী থাকতে পারে, তাহলে কি আমাদের সারা দেশ মিলিয়েও এক হাজার পিএইচডি শিক্ষার্থী থাকতে পারে না?

দৈনিক প্রথম আলো, ৬ জুন ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারও মনে দুখ দিয়ো না...

মে মাসের শেষের দিকে আমি দেশের বাইরে, ইন্টারনেটে খবরের কাগজ পড়ি। একদিন পত্রিকায় একটা খবর পড়ে আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। জাতিসংঘের কোনো একটা অধিবেশনে বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ঘোষণা দিয়েছেন, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই (ডেইলি স্টার, ২৮মে)! মাত্র অল্প কয়দিন আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে– প্রথমবারের মতো আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, প্রতিবন্ধী কোটার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী কোটায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেছি। দেশের বাইরের নেপালি ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে এসেছি, অথচ দেশের চাকমা, মারমা, ম্রো, সাঁওতাল বা গারো ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারি না; সেটা নিয়ে আমাদের দুঃখবোধ ছিল। আদিবাসী কোটায় তাদের পড়াতে পারব, সেটা নিয়ে আমাদের একধরনের আত্মতুষ্টি ছিল, কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দেশে যদি আদিবাসী নেই, তাহলে আদিবাসী কোটায় আমরা কাদের ভর্তি করেছি? শুধু কি তাই, কত হইচই করে শিক্ষানীতি করা হয়েছে, আমিও সেই কমিটির একজন সদস্য, সেই শিক্ষানীতিতে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা লিখে এসেছি। তাহলে আমাদের সেই কথাগুলো কার জন্য?

দেশে থাকলে বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যেত। বিদেশে এখন পরিচিত দেশের মানুষ শুধু আমার স্ত্রী। কাজেই তার সঙ্গেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি তাকে বোঝালাম, ফার্স্ট সেক্রেটারি নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞ মানুষ, এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথা বলে ফেলেছেন। জাতিসংঘের অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পকেট থেকে ভুল কাগজ বের করে ভুল ভাষণ দিয়ে ফেলেন বলে শুনেছি। এটা সম্ভবত সে রকম একটা

www.BanglaBook.org

কিছু। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ রকম বেঁফাস একটা কথা বলে ফেলার জন্য তাঁর চাকরি চলে যায় কি না, সেটা নিয়েও আমরা একটু দুশ্চিন্তা অনুভব করলাম।

সপ্তাহ খানেক আগে খবরের কাগজ পড়ে আমার আবার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি আবার সেই কথাগুলোই বলেছেন, আরও অনেক স্পষ্টভাবে বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। আমাদের দেশের যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর জন্য আমার অনেক শ্রদ্ধাবোধ, ডা. দীপু মনি তাঁদের একজন। রাজনীতি করার আগে তিনি যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, সে রকম আর কেউ আছেন কি না আমার জানা নেই। তিনি যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী না হয়ে একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা হতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর বাসায় হাজির হয়ে বিষয়টা বুঝতে চাইতাম। এখন আমি জানি, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই। অনেক ওপরের পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, নিচের পর্যায়ে এখন স্টিম রোলার চালানো শুরু হয়েছে, কারও কিছু করার নেই।

কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের দুঃখ বা শোকের কথা বলতে পারব না? প্রথমত, আদিবাসী কথাটা ডিকশনারিতে কীভাবে ব্যাখা করা আছে, সেটা দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল-কলেজের বিতর্কের শুরুতে ডিকশনারি বা এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে ব্যাখা দেয়। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সেটা করতে হয়– আমি জানতাম না। শুধু কৌতূহলের জন্য আমি ডিকশনারিতে ক্রসফায়ার শব্দটির অর্থ খুঁজেছি। র‍্যাব যখন বিনা বিচারে, সন্দেহভাজন কাউকে গুলি করে মেরে ফেলে, সেটা হচ্ছে ক্রসফায়ার– ডিকশনারিতে সেটা লেখা নেই। আমার বাসায় ডিকশনারি নেই, থাকলে রাজাকার শব্দটির অর্থ খুঁজে দেখতাম। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী বা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মতো দেশদ্রোহী মানুষ যাঁরা স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পদলেহী হয়ে এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন রাজাকার– সেই কথাটি ডিকশনারিতে লেখা থাকবে না। আমি যত দূর জানি, সেখানে রাজাকার শব্দের অর্থ লেখা আছে সাহায্যকারী। কাজেই সব শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য ডিকশনারিতে যেতে হয় না। অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ডিকশনারিতে বেঁধে দেওয়া অর্থ থেকে অনেক বেশি ব্যাপক। আদিবাসী ঠিক সে রকম একটা শব্দ। আমরা বহুদিন ধরে এই শব্দটা ব্যবহার করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছি। হঠাৎ করে দেশের সরকার তাদের নিজস্ব একটা অর্থ দিয়ে এটাকে বেঁধে ফেলতে পারবে না। যদি তার চেষ্টা করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা খুব দুর্ভাবনায় পড়ে যাব।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পরপরই জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা দেবাশীষ রায় প্রথম আলোতে একটা লেখা লিখেছিলেন (২৯জুলাই ২০১১)। সেখান থেকে আমরা জানি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক কিছুই ঠিক বলেননি। একজন মানুষ একটা ভুল তথ্য দিতে পারেন, সেটা পরে শুদ্ধ করে নিলে ঝামেলা মিটে যায়। এবারের বিষয়টি আরও চমকপ্রদ– বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব ব্যাখা দিয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, তারা বাংলাদেশ সরকারের ব্যাখাটা মেনে নেবে না, বহুদিন থেকে সর্বজনস্বীকৃত যে ব্যাখার ওপর নির্ভর করে আছে, সেটাই তারা মেনে চলবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরো বক্তব্যটা আসলে মধুর বক্তব্য নয়, তাঁর ভেতরে কেমন জানি হিংসা হিংসা ভাব। তাঁর বক্তব্য দিয়ে মনে হচ্ছে পুরো দেশটাকে একটা হিংসুটে, নীচ, সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হলো। আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, এটা মোটেও আমাদের দেশের মানুষের কথা নয়। আমাদের দেশের মানুষ রীতিমতো যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে যখন এই দেশ স্বাধীন করেছিল, তখন সবচেয়ে বড় বিষয়টিই ছিল যে এই দেশের সব মানুষ সমান। এই দেশের মানুষকে আমরা সংবিধানে স্বীকার করে নেব, তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকারটুকু দেব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের একপর্যায়ে বলেছেন, জনসংখ্যার মাত্র ১ দশমিক ২ শতাংশ মানুষকে বিশেষ আর উন্নত পরিচয় দিতে গিয়ে বাকি ৯৮দশমিক ৮ শতাংশ মানুষের অধিকার হরণ করা যাবে না। আমরা তো সবাই এক সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ করে কেন আমাদের একে অন্যের প্রতিপক্ষ তৈরি করা হলো? কেন বোঝানো হলো তাদেরকে কিছু একটা দিতে হবে সেটা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দিতে হবে? শুধু কি তাই, আর বক্তব্যের মধ্যে পাহাড়ি মানুষদের জন্য একধরনের তাচ্ছিল্য আর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন, তারা বাঙালিদের মতো এখানকার খাঁটি আধিবাসী নয়, ইতিহাসের কোনো এক সময় 'অর্থনৈতিক' সুযোগ সুবিধার জন্য এই দেশে 'রাজনৈতিক' আশ্রয় নিয়েছে মাত্র। আমেরিকা-ইউরোপে আদম ব্যাপারিরা যেভাবে লোকজন পাঠিয়ে দেয়, তারা ছোটখাটো কাজ করে টাকা-পয়সা কামাই করে এবং চেষ্টা করে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকার জন্য–

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা ঠিক সে রকম। আমি জানি, তাঁর এই বক্তব্যে পাহাড়ি মানুষেরা মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। ব্যাপারটির সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না– হঠাৎ করে কেন এটা এভাবে বলা হলো, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা তো চেষ্টা করি আমাদের কথাবার্তায় কাজকর্মে কাউকে আঘাত না দিতে। হঠাৎ করে কেন গায়ে পড়ে কিছু মানুষকে অপমান করা হলো?

আমি বিষয়টি ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাইনি। তখন হঠাৎ করে খবরের কাগজে ছোট একটা খবর পড়ে আমার মনে হলো, আমি পেছনের কারণটি অনুমান করতে পারছি। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনী হিসেবে অসম্ভব দক্ষতা নিয়ে কাজ করে এসেছে। আমি জানি তাদের এই কাজ শুধু দায়িত্ব পালন নয়, তার থেকে অনেক বেশি আন্তরিক। সে জন্য কোনো একটি দেশ তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকেই স্থান করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমি শুনেছি, আমাদের সেনাবাহিনীর লোকজন সে দেশে এত জনপ্রিয় যে তারা যদি সে দেশে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারত, তাহলে বিপুল ভোটে বিজয় পেতে পারত। এই খবরগুলো জেনে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সবার ভালো লাগে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও সত্যি, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পাহাড়ি মানুষ আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে গোপন ছিল। শান্তিচুক্তির ঠিক আগে আগে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখ সব পত্রপত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি ছাপানো হয়েছিল। সেই ঘটনাপঞ্জি যারা পড়েছে শুধু তারাই জানে, সেই এলাকায় মানবতার বিরুদ্ধে কী ভয়ংকর অপরাধ করা হয়েছিল। শান্তিচুক্তির পর হঠাৎ করে সব বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা সত্যি নয়। আমরা জানি, তার পরও পাহাড়ি মানুষেরা নানা ধরনের বিচ্ছিন্ন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে, শুধু যে পত্র-পত্রিকায় পড়েছি তা নয়, আমি নিজের কানেও তাদের কাছ থেকে কিছু বর্ণনা শুনেছি।

আদিবাসী বিতর্ক শুরু হওয়ার পর আমি খবরের কাগজে দেখেছি, জাতিসংঘে আলোচনা করা হচ্ছে, সেনাবাহিনীর যেসব সদস্য আদিবাসীদের সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তাদের যেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে না দেওয়া হয়। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনাবাহিনী যে শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন দিয়ে ফেলেনি, তার পেছনেও এই শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দেওয়ার সুযোগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কাজেই এখন যদি আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার করাটা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোগ দেওয়ার জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার সবচেয়ে সহজ সমাধান হবে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া, এই দেশে আদিবাসী বলেই কিছু নেই। যদি আদিবাসী না থাকে, তাহলে তাদের ওপর অত্যাচারটা করার প্রশ্নই তখন থাকবে না। অত্যন্ত জটিল একটা সমস্যার এর থেকে সহজ সমাধান আর কী হতে পারে?

এটি আমার একটি অনুমান, যদি সরকার বা সেনাবাহিনীর কেউ আমার অনুমানটিকে ভুল প্রমাণ করিয়ে দেন, তাহলে আমার থেকে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

২.

আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র বেল কমিউনিকেশন্সে কাজ করি তখন মাঝেমধ্যেই আমাদের গ্রুপের সবাই দল বেঁধে পিতজা (শব্দটা পিজা বা পিজজা নয়, আসলে পিতজা) খেতে যেত। একদিন সে রকম একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি লক্ষ করলাম, আমাদের গ্রুপে সাদা চামড়ার আমেরিকানের সংখ্যা বলতে গেলে নেই। সেখানে ফ্রাঞ্চ, জার্মান, ভারতীয়, বাংলাদেশি (আমি), চায়নিজ, কোরিয়ান, গ্রিক এককথায় পৃথিবীর সব দেশের মানুষ আছে। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এত দ্রুত পৃথিবীতে এত ওপরে উঠে গেছে, তার একটা কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবীর সব কালচারের মানুষ এখানে পাশাপাশি থাকে। ডাইভারসিটি বা বৈচিত্র্য হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা সম্পদ।

দেশে ফিরে এসে আমি এই বৈচিত্রের অভাবটি খুব বেশি অনুভব করেছি। আমাদের সবাই দেখতে এক রকম, আমরা প্রায় সবাই এক ভাষায় কথা বলি, আমাদের সংস্কৃতিও এক রকম। আমাদের দেশের ভিন্ন ভাষা বা সংস্কৃতির মানুষ হচ্ছে এই অত্যন্ত অল্প কয়জন আদিবাসী। আমাদের নিজেদের জন্যই এই আদিবাসীদের বুকে আগলে রাখা উচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ভিন্ন দেশ নেপালের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পড়িয়ে এসেছি, কিন্তু আমরা নিজের দেশের একজন সাঁওতাল, গারো বা ম্রো ছাত্রছাত্রীদের এখানে পড়াতে পারিনি– সেটা আমার অনেক বড় দুঃখ। কয়েক বছর আগে আমি রাঙামাটির একটা স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। সেখানে হঠাৎ করে লক্ষ করলাম, একটা ছোট্ট পাহাড়ি শিশু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে,

www.BanglaBook.org

হাতে একটা বই এবং সে খুব সাহস করে আমার কাছে আসতে পারছে না। এটি আমার জন্য খুবই পরিচিত একটা দৃশ্য। আমি তাকে কাছে ডাকলাম এবং হাতে ধরে রাখা আমার লেখা কোনো একটা কিশোর উপন্যাসে অটোগ্রাফ করে দিলাম। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, সে ম্রো শিশু এবং সে যেখানে থাকে তার আশেপাশে কোনো স্কুল নেই বলে রাঙামাটির এই স্কুলে হোস্টেলে থেকে পড়ে। বইমেলা চলার সময় কেনো কোনো দিন বাংলা একাডেমীর বটগাছের নিচে বসে বসে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে অটোগ্রাফ দিয়েছি। কিন্তু সেই একটি ম্রো শিশুর বইয়ে অটোগ্রাফ দিতে আমি তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমি এই দেশের আদিবাসী একটা শিশুর কাছে পৌছাতে পেরেছি।

শৈশবে আমার বাবা বান্দরবানে পুলিশ অফিসার হিসেবে ছিলেন। আমি সেখানকার স্কুলে পড়েছি। আমাদের স্কুলে অল্প কয়েকজন বাঙালি ছেলেমেয়ে ছিল। বেশির ভাগই ছিল পাহাড়ি। আমার মনে আছে, আমার সেই পাহাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে শঙ্খ নদের তীরে কিংবা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাষার খানিকটা দূরত্ব ছিল, কিন্তু সেটি মোটেও কোনো সমস্যা ছিল না। শুধু ভাষা নয়, তাদের গায়ের রং, মুখের ছাপ, পোশাক, আচার-আচরণ সেগুলোও ভিন্ন ছিল, কিন্তু সেই শৈশবে, আমি নিজের মতো করে আবিষ্কার করেছিলাম, এই ভিন্নতাটুকুই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বড় হয়ে বুঝেছি, বৈচিত্রটাই হচ্ছে সৌন্দর্য। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সেই পাহাড়ি বন্ধুরা আর আমরা কিন্তু একই মানুষ।

তাই আমার খুব দুঃখ হয়, যখন দেখি এই দেশে আমার সব অধিকার আছে, অথচ আমার শৈশবের সেই বন্ধুরা এই দেশে সংবিধানে একটুখানি অধিকারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা সেটা পাচ্ছে না। শুধু যে পাচ্ছে না তা নয়, একেবারে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিচ্ছি।

বিষয়টা কেমন করে নিস্পত্তি হবে আমি জানি না। আমি শুধু একটা জিনিস জানি, এই দেশের সব মানুষ যখন কোনো একটা কিছু চায়, তখন তারা সেটা আদায় করে নিতে পারে। আর দেশের মানুষের কেনো একটা কিছু চাওয়া শুরু হয় এই দেশের তরুণ প্রজন্ম দিয়ে। তাই আমার খুব ইচ্ছে, এই দেশের তরুণ প্রজন্ম বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করুক। তাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কেন একজন গারো, সাঁওতাল কিংবা ম্রো সহপাঠী নেই, সেই প্রশ্নটা সবাইকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে থাকুক। সারা পৃথিবী যখন 'ডাইভারসিটি' নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে, তখন আমরা কেন সেটাকে চাপা দিয়ে চোখের আড়াল করতে চাইছি, সেটা জানার চেষ্টা করুক। আমরা বাঙালিরা শতকরা ৯৮ দশমিক ৮ ভাগ থেকেও মাত্র ১ দশমিক ২ ভাগ আদিবাসী মানুষের দায়িত্ব নিতে পারব না, সেটা তো হতে পারে না।

আদিবাসীদের নিয়ে এই বিতর্কটুকু দেখে আমি একটু আতঙ্ক অনুভব করেছি, তার কারণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সেখানে ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ বাঙালি যে বাকি ১ দশমিক ২ ভাগ মানুষ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যখন কোনো জাতি নিজেকে অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, তার ফল হয় ভয়ানক। জার্মানির নাৎসিরা ভেবেছিল, ফিলিস্তিনে ঐশ্বরিক অধিকার পাওয়া ইসরায়েলিরা ভাবে। সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে নরওয়ের গণহত্যাকারী সেই উন্মাদ, যার ধারণা তার খাঁটি জাতিটাকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। আমরা দুর্নীতিপরায়ণ অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ জাতি, আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই– আমি মোটেও সে কথা বিশ্বাস করি না। আমি প্রায় অনুভব করতে পারি, আমাদের নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এটাও বিশ্বাস করি না, দেশের ৯৮ দশমিক ৮ ভাগ মানুষ হিসেবে এই দেশে আমার অধিকার বেশি।

আদিবাসী বিতর্ক দেখে আমি হয়তো দুর্ভাবনা অনুভব করেছি, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই দেশের আদিবাসীরা একটা আঘাত পেয়েছে, তাদের ভেতরকার অনুভূতি হচ্ছে দুঃখ।

আমি জানি না সরকারকে কোনো কথা বলা যায় কিনা। যদি যেত, তাহলে আমি তাদের ওমর খৈয়ামের কবিতার একটি লাইন শোনানোর চেষ্টা করতাম–

'কারও মনে দুখ দিয়ো না, কারো বরং হাজার পাপ করো'। হাজার পাপ করার থেকেও কারও মনে দুঃখ দেওয়া যে অনেক বেশি নির্মম, এই সহজ কথাটা বোঝা কি এতই কঠিন?

দৈনিক প্রথম আলো, ৯ আগস্ট ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুলিশ বাহিনী এবং সাধারণ প্রত্যাশা

মানুষের চরিত্র নিশ্চয়ই খুব জটিল। যে মানুষটি একা শান্ত এবং নিরীহ সে একটা দলের (mob) মাঝে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। শুধু যে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে তা নয়, অবলীলায় দুই চারজনকে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। মাত্র কিছুদিন আগে সাভারের কাছে আমরা সেরকম একটা ব্যাপার ঘটতে দেখেছি যেখানে নিরীহ গ্রামবাসী ডাকাত সন্দেহ করে ছয়জন ছাত্রকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এই রকম ভয়ংকর একটা ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা গণপিটুনি নামে একটা শব্দ পর্যন্ত আবিষ্কার করে রেখেছি। আবার সেই মানুষটিকে আমরা খুবই সাধারণ মানুষ হিসেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি এবং যার কাছে বড় কিছু আশা করি না, আমরা দেখি ভয়ংকর কোনো একটা পরিবেশে সে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে নরসিংদির কাছাকাছি দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে– একটি বাসে আমার একজন সহকর্মী ছিল, সে প্রাণে বেঁচে গেছে এবং তার মুখে শুনেছি দুর্ঘটনার সেই ভয়ংকর মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে একজন সাধারণ রিকশাওয়ালা কারো জন্যে অপেক্ষা না করে নিজের দায়িত্বে একজনের পর আরেকজন আহত মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমি নিজে বিশ্বাস করি মানুষের মাঝে এক ধরনের ঐশ্বরিক ব্যাপার থাকে, একজন মানুষের জন্যে অন্য একজন মানুষের একধরনের ভালোবাসা থাকে এবং সে জন্যেই এই পৃথিবীটা এখনো টিকে আছে।

তারপরও আমরা পৃথিবীতে ভয়ংকর ভয়ংকর অমানবিক ঘটনা ঘটতে দেখি। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ছেড়ে দিই সেখানে অমানবিক হওয়াটাই স্বাভাবিক, অত্যন্ত স্বাভাবিক– পরিবেশে, সভ্য দেশের সুস্থ মানুষেরা সমস্ত নিয়ম নীতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেঙ্গে অমানুষ হয়ে উঠতে পারে। নিউইয়র্কে এক রাতে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল আর তখন সকল মানুষ মিলে পুরো শহরটা লুটপাট করে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ ইচ্ছে করলে একটা সতর্ক জীবন যাপন করতে পারি, যেখানে আমাদের অন্য মানুষের হীনতা দেখতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কী আমি আমার জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছি যেখানে আমাকে কোনো অসৎ মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় নি। গত জোট সরকারের আমলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অসৎ ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেওয়ার পর আমি আমার জীবনের প্রথম অসৎ মানুষ দেখেছিলাম– সেটি আমার জন্য খুব বড় একটা অভিজ্ঞতা ছিল!

যারা পুলিশ বাহিনীতে কাজ করেন তাদের জীবন নিশ্চয়ই খুব কঠিন-- তারা নিশ্চয়ই আমার মত সৌভাগ্যবান নন যে সবার জীবনে এমন একটি অসৎ মানুষ দেখেছেন! তাদের চাকুরিটাই তৈরি করা হয়েছে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে, অপরাধ দমন করার জন্যে, অপরাধীদের ধরার জন্যে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে নিশ্চয়ই অসংখ্য অসৎ মানুষের মুখোমুখি হতে হয়, অপরাধীদের পিছনে ছুটোছুটি করতে হয়। আমার মনে হয়, সমাজের সবচেয়ে নিষ্ঠুর, জটিল এবং দুর্বোধ্য মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে তাদের মানুষ সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা জন্মে যেতে পারে। তাদেরকে নিশ্চয়ই সেই নেতিবাচক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং সেটি নিশ্চয়ই একটি কঠিন ব্যাপার।

আমার ধারণা, আমরা যারা একধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জীবন কাটাই তারা পুলিশ বাহিনীর কঠিন জীবনটির কথা মনে রাখি না। তাদেরকে যে এক ধরনের চাপের মাঝে জীবন কাটাতে হয় আমরা সে কথাটা ভুলে যাই। আমার বাবা পুলিশে চাকরি করতেন, তার বুকের ভেতর এক ধরনের কোমল হৃদয় ছিল। তার লেখালেখির আগ্রহ ছিল, উনিশ শ একাত্তর সালে পাকিস্তান মিলিটারীর হাতে মারা যাবার পর আমাদের বাসা লুট করে নেবার পর তার সমস্ত লেখালেখি হারিয়ে যায়। শুধুমাত্র একটি প্রকাশিত বই রক্ষা পেয়েছে। আমি সেই বইয়ের গল্পগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে একজন পুলিশ অফিসারের জীবনের একটা ইঙ্গিত পাই। গল্পগুলোর চরিত্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক এবং অপরাধী– তিনি তার জীবনে যেগুলো দেখেছেন। কিন্তু তার পরেও তার ভেতরে মানবিক সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

www.BanglaBook.org

পুলিশ বাহিনীর সবার জন্যেও নিশ্চয়ই এই কথাগুলো সত্য– তারা একটা কঠিন পরিবেশে সুস্থ সুন্দর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চান। অনেকে পারেন আবার অনেকে পারেন না। যারা পারেন না তারা পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ান। মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাত্রকে ডাকাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তা শুধু যে তার নিজের সুনাম নষ্ট করেছেন তা নয়– পুরো পুলিশ বিভাগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছেন।

কাজেই পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব অন্য যে কোনো বাহিনী থেকে অনেক বেশি। একটা কঠোর জীবনে তাদের দিন কাটাতে হবে– কিন্তু তারা নিজেরা কখনোই কঠোর কিংবা হৃদয়হীন হতে পারবেন না। তাদেরকে যে কোনো মূল্যে মানবিক থাকতে হবে– দেশের মানুষ কিন্তু তাদের কাছে সেটাই আশা করে।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের সুভেনির, ৮ আগস্ট ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভূমিকম্প

বেশ কিছুদিন আগে একজন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল কলাম লেখক হলে কী করতে হয়। আমি তাকে বলেছিলাম, কী সর্বনাশা কথা! তুমি কোন দুঃখে কলাম লেখক হতে যাবে? কলাম লেখক মাত্রই হচ্ছে নিন্দুক এবং ছিদ্রান্বেষী। যে কোনো বিষয়ের একটা খুঁৎ বের করে তারা খবরের কাগজ কাঁদুনে গাইতে থাকে। সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে তাদের সবজান্তা ভাব– পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ের উপরে তারা 'জ্ঞানগর্ভ' কিছু একটা লিখে ফেলতে পারে। আমি সেই ছেলেটি (কিংবা মেয়েটি) কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলাম কলাম লেখক না হয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের লেখক হয়ে যাও– সেটা খুব আনন্দের। সাধারণত আমি সতর্ক থাকার চেষ্টা করি, যে বিষয়টা জানি না সেটা নিয়ে মুখ খুলতে চাই না, তারপরেও যে মাঝে মাঝে মুখ খুলে ফেলি না তা নয়– যেরকম আজকে করেছি।

ঈদের আগের দিন রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষই মোটামুটিভাবে একটা ভূমিকম্প টের পেয়েছে। এটা এমন কোনো বড় ঘটনা নয় কিন্তু আমি দেখলাম এই ভূমিকম্পের পর কিছু দায়িত্বশীল মানুষ বলেছেন এটা বড় কোনো একটা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস হতে পারে, সেটা শুনে আমার মনে হল ভূমিকম্প সম্পর্কে সাধারণ কিছু তথ্য সবার জানা উচিৎ। তাহলে একদিকে তারা অকারণে আতংকিত হবে না অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সতর্কতাটুকু নিতে পারবে।

ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার জ্ঞান হয়েছে আশীর দশকে আমি যখন ক্যালটেকে পোস্টডক করতে গিয়েছি। যারা ভূমিকম্প ভালোবাসেন কিংবা ভূমিকম্প দেখতে চান তারা ক্যালিফোরনিয়ার লস এঞ্জেলস বা সানফ্রান্সিসকো এলাকায় যেতে পারেন– সেখানে সবসময়ই আশেপাশে কোথাও না কোথাও

www.BanglaBook.org

ভূমিকম্প হচ্ছে! ভূমিকম্প হলেই সেটাকে রিখটার স্কেলের একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় (ঈদের আগের দিনের ভূমিকম্পটি ছিল রিখটার স্কেলে 4.8), প্রফেসর রিখটার ক্যালটেকের প্রফেসর ছিলেন, কাজেই ক্যালটেকে গিয়ে আমি না চাইতেই ভূমিকম্প সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান হয়ে গেল। প্রথম জ্ঞানটি এরকম: রিখটার স্কেলে সংখ্যা এক গুণ বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কাঁপুনি দশগুণ বেড়ে যাওয়া।

১৯৮৭ সালের অক্টোবরের ৩ তারিখ ভোর বেলা আমি বাথরুমে, হঠাৎ করে দেখলাম আমার নিচের মেঝে জীবন্ত প্রাণীর মত ঝটকা মেরে আমাকে ফেলে দিল। এই এলাকা দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত (কিংবা বিশ্বকুখ্যাত) সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন গিয়েছে সেখানে অমিত পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় হয়ে আছে এবং যে কোনো একদিন এই সান এন্ড্রিয়াজ ফল্ট লাইন গা ঝাঁকুনি দিয়ে তার শক্তিটা ভূমিকম্প হিসেবে ছেড়ে দিবে। সবাই সেই অবশ্যম্ভাবী ভূমিকম্পটাকে বলে 'দি বিগ ওয়ান' এবং বাথরুমে ঝটকা খেয়ে আমার প্রথমেই মনে হল এটা নিশ্চয়ই সেই বিগ ওয়ান! আমি কোনো রকমে বাথরুম থেকে বের হয়েছি, করিডোর ধরে ছুটে যাবার সময় করিডোরের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে পিংপং বলের মত ঠোকা খেতে খেতে শোয়ার ঘরে গিয়ে আমার দুই বছরের ছেলেকে বগলে চেপে সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে দোতালার সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে হাজির হয়েছি।

অনেকের ধারণা হতে পারে ভূমিকম্পের সময় বাইরে খোলা জায়গায় হাজির হতে পারলে বুঝি এক ধরনের নিরাপত্তার ভাব চলে আসে। বড় ভূমিকম্পের সময় সেটি সত্যি নয়, আমরা সব সময়েই শক্ত মাটির উপরে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত, নিজের অজান্তেই আশা করে থাকি যে এই শক্ত মাটি আমাদের ধরে রাখবে। কিন্তু যখন আবিষ্কার করি যে শক্ত মাটিটা দুলছে এবং আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কোনো জায়গা নেই তখন কেমন জানি অসহায় বোধ হয়। সেই ভূমিকম্পের সময় আমি আরো একটি বিচিত্র বিষয় দেখেছিলাম যেটি কখনোই ভুলব না, নদীর পানির উপর দিয়ে যেরকম ঢেউ যায়, শক্ত মাটির উপর দিয়ে সেরকম ঢেউ আমাদের পায়ের নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ভূমিকম্প থেমে যাবার পর আমরা বাসায় ফিরে গিয়ে একটা বিচিত্র ব্যাপার আবিস্কার করলাম, দুই বছরের বাচ্চারা ভূমিকম্পকে বিশেষ আমোদের ব্যাপার মনে করে। বড় একটা ভূমিকম্পের পর অসংখ্য ছোট ছোট ভূমিকম্প হতে থাকে (এদের বলা হয় আফটার শক) এবং দুই বছরের সন্তান এর প্রত্যেকটা

www.BanglaBook.org

আফটার শক্‌কে ডুগুডুগু নাম দিয়ে আনন্দে নাচানাচি করতে থাকে! আমরা কিছুক্ষণের মাঝে জেনে গেলাম এটা মোটেও 'দি বিগ ওয়ান' নয়। এটা একবারেই মাঝারি সাইজের ভূমিকম্প এবং রিখটার স্কেলে এর মান মাত্র 6.1, তবে এর উৎপত্তিস্থল (বৈজ্ঞানিক নাম এপিসেন্টার) খুব কাছাকাছি তাই আমরা এতো প্রবলভাবে এটা অনুভব করতে পেরেছি।

যারা এখনো ধৈর্য্য ধরে লেখাটা পড়ছেন তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে একটু বিরক্ত হয়ে ভাবতে শুরু করেছেন, এই মানুষটি কেন তার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি এতো সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করেছে! তার একটি ছোট কারণ আছে– সেই ভূমিকম্পের পর আমি হঠাৎ করে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়লাম, আতংকগ্রস্থ হওয়ার কারণটিও খুব সহজ। আমি জীবনের প্রথম রিখটার স্কেলে 6-এর কাছাকাছি একটা ভূমিকম্প দেখলাম। এই ভূমিকম্পটি আমাকে বাসার কয়েকফিট চওড়া করিডোরের একমাথা থেকে অন্যমাথায় ছিটকে ফেলেছে। এই এলাকায় যে কোনোদিন যখন 'দি বিগ ওয়ান' আঘাত করবে সেটি হবে রিখটার স্কেলে আট থেকে নয়ের কাছাকাছি, যার অর্থ ভূমিকম্পের কাঁপুনি হবে সদ্য দেখা কাঁপুনি থেকে একশ গুণ বা হাজার গুণ বেশি। সেই ভূমিকম্প আমাকে কয়েকশ ফুট বা কয়েক হাজার ফুট চওড়া করিডোরের একমাথা থেকে অন্যমাথায় ছিটকে ফেলে দেবে। তাহলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কোথায়? সত্যি সত্যি যদি 'দি বিগ ওয়ান' হাজির হয় তাহলে আমাদের কী হবে?

আমি আবিস্কার করলাম রাতে আমার চোখে ঘুম আসে না। আমাদের বাসাটি ছিল কাঠের বাসা, ভূমিকম্পে কাঠের বাসা খুব নিরাপদ। বড় বড় ঝাঁকুনি অবলীলায় সহ্য করে তবে পুরো বাসা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে সেটি জানান দেয়। দামী সিসমোগ্রাফও যেসব ভূমিকম্প ধরতে পারে না আমাদের কাঠের বাসা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে সেই ভূমিকম্পের কথা আমাকে জানিয়ে দেয়। আমি সারারাত স্ত্রী ও পুত্রের পাশে জেগে বসে থাকি।

এরকম আমি ক্যালটেকের বইয়ের দোকানে গিয়ে ভূমিকম্পের উপর একটি বই কিনে আনলাম, ভারী চমৎকার বই, রাত জেগে সেই বইয়ের সবকিছু পড়ে আমার ভেতরে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের শান্তি ফিরে এল এবং আমি আবার রাত্রে ঘুমাতে শুরু করলাম। গভীর রাতে হঠাৎ করে কাঠের বাসা যখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দুলে উঠে আমাকে জানিয়ে দিত একটা ভূমিকম্প হচ্ছে আমি আতংকে ছোটাছুটি না করে শুয়ে থাকতে পারতাম!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তখন ভূমিকম্প সম্পর্কে যেসব শিখেছি তার কিছু এখানে লিখছি, সে জন্যেই এতো বড় ভূমিকা!

২

প্রথমেই আমি শিখেছি রিখটার স্কেল। বিষয়টা খুবই সহজ। ভূমিকম্প মানেই কাঁপুনি সেই কাঁপুনির লগ হচ্ছে রিখটার স্কেল (যারা লগ ভুলে গেছে তাদের মনে করিয়ে দেই 10 এর লগ 1, 100 এর লগ 2, 1000 এর লগ 3 ইত্যাদি।) কাঁপুনিটা মাপতে হবে মিলিমিটারে তারপরে তাকে এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে তারপর লগ নিতে হবে। যেমন ধরা যাক ঈদের আগের রাতের ভূমিকম্পটি, সেটা নিশ্চয়ই কয়েক মিটার ছিল না, আমরা যেহেতু টের পেয়েছি কাজেই নিশ্চয়ই কয়েক মিলিমিটারের বেশি ছিল, ধরে নেই সেটা ছিল দশ সেন্টিমিটার। কাজেই মিলিমিটারে সেটা একশ মিলিমিটার, এক হাজার দিয়ে গুণ দিলে সংখ্যাটি হয় এক লক্ষ এবং এক লক্ষের লগ হচ্ছে পাঁচ। কাজই আমরা অনুমান করতে পারি ভূমিকম্পটি রিখটার স্কেলে ছিল পাঁচ (আসলে সেটা ছিল 4.8 মোটামুটি কাছাকাছি!) যারা চালাক চতুর পাঠক তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হতাশভাবে মাথা নাড়তে শুরু করেছেন, কারণ একটা বাচ্চা ছেলেও জানে যে ভূমিকম্পের ঠিক উৎপত্তিস্থলে কাঁপুনি হবে বেশি, একটু দূরে গেলে সেটা হবে কম। আমি যে পদ্ধতিটার কথা বলেছি সেই পদ্ধতিতে নেপালে রিখটার স্কেলে সাত মাত্রার ভূমিকম্প হলে দিনাজপুরে সেটাকে মনে হতে পারে ছয় মাত্রার, ঢাকায় পাঁচ মাত্রার, চট্টগ্রামে তিন মাত্রার– সেটা তো আর গ্রহণযোগ্য বিষয় হতে পারে না। কাজেই যখন রিখটার স্কেল তৈরি করা হয়েছিল তখন প্রফেসর রিখটার বলে দিয়েছেন কাপুঁনিটা মাপতে হবে একশ কিলোমিটার দূর থেকে! যারা সত্যিকার ভূমিকম্প দেখেছে তারা জানে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলে মাপামাপির সুযোগ থাকে না, সেটা সঠিকভাবে মাপতে হলে দূর থেকে মাপাই বুদ্ধিমানের কাজ!

যারা একটু বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক তারা নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন, একটা ভূমিকম্প হলে তার কাঁপুনিটা কতো সেটা না হয় চেষ্টাচরিত্র করে মাপা যায়– কিন্তু কতদূর থেকে এসেছে সেটা কেমন করে বোঝা যাবে? আসলে সিসমোগ্রাম দেখলে সেটা বোঝা যায়। আমরা যেটাকে শব্দ বলি সেটা বাতাসের কম্পন, বাতাস ছাড়াও কঠিন বস্তুতেও সেই কম্পন হওয়া সম্ভব। যখন

www.BanglaBook.org

ভূমিকম্প হয় তখন সবার আগে এই কম্পনটা হাজির হয়, তাই এর নাম প্রাইমারি ওয়েভ। ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর যে ভয়ংকর ভূমিকম্পের (রিখটার স্কেলে 9.3) কারণে প্রলয়ংকারী সুনামী এই এলাকার সমুদ্র উপকূল লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল তার প্রাইমারি ওয়েভ কিন্তু আমরা অনেকেই দেখেছি, তার কারণে পুকুরের পানি তখন লাফিয়ে উপরে উঠেছিল। (ভূমিকম্পটি কোথায় হয়েছে বোঝার জন্য আমি দেশের ভেতরে অনেক জায়গায় টেলিফোন করেছিলাম, একবারও কল্পনা করিনি সেটা পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠ থেকে চলে এসেছে।) ভূমিকম্পের প্রাইমারি ওয়েভের একটু পরে আসে সেকেন্ডারী ওয়েভ, সেটা তৈরি হয় মাটির নিচের কঠিন পাথরের নড়াচড়া দিয়ে (তাই সেটা পানির ভেতর দিয়ে যেতে পারে না)। প্রাইমারি ওয়েভের কতোক্ষণ পর সেকেন্ডারি ওয়েভ এসেছে সেটা দেখে বোঝা যায় ভূমিকম্পটি কতদূর থেকে এসেছে। (দুটির গতিবেগের পার্থক্য সেকেন্ডে দশ কিলোমিটারের মত।)

যারা এতোটুকু পড়ে অধৈর্য্য হয়ে গেছেন তাদের জন্যে সুসংবাদ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য সিসমোগ্রাফ বসানো আছে, একটি ভূমিকম্প হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো থেকে নিখুঁতভাবে বের করে ফেলা হয় ভূমিকম্পটি কতো মাত্রায় এবং তার এপিসেন্টার কোথায়। কাজেই যে কেউ ইন্টারনেট থেকে সেটা বের করে নিতে পারেন। আমার খুব ভালো লেগেছে যে ঈদের আগের দিনের ভূমিকম্পটি কতো মাত্রার এবং এপিসেন্টারটি কোথায় সেটা আমাদের দেশের সিসমোগ্রাফ থেকেই বের করে ফেলা হয়েছে।

রিখটার স্কেলে কীভাবে ভূমিকম্প মাপা হয় তার সঠিক পদ্ধতি না জানলেও এমন কিছু ক্ষতি নেই কিন্তু কোন মাত্রার ভূমিকম্প কতো শক্তিশালী সেটা সবারই জানা উচিৎ। চার মাত্রার নিচে যে সব ভূমিকম্প হয় সেগুলো বিবেচনার মাঝে না আনলে ক্ষতি নেই। বছরে পৃথিবীতে প্রায় পনেরো হাজার এরকম ভূমিকম্প হয়, আমরা সেগুলো টেরও পাই না। আবার রিখটার স্কেলে আট মাত্রার ভূমিকম্প এতো ভয়ংকর যে সেটা নিয়েও আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই– এরকম একটা ভূমিকম্প হলে সেটা থেকে রক্ষা পাওয়া হবে কাকতালীয় ব্যাপার। আট মাত্রা বা তার থেকে বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় খুবই কম। বছরে একটি বা দুটি এবং সেগুলো হয় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রগুলোতে। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে মাঝখানের ভূমিকম্পগুলো নিয়ে, রিখটার স্কেলে পাঁচ, ছয় এবং সাত।

রিখটার স্কেলে পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্পে যে পরিমাণ শক্তি বের হয় তার

www.BanglaBook.org

পরিমাণ হিরোশিমার পারমানবিক বোমার সমান! তবে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই কারণ পারমানবিক বোমার পুরো শক্তিটা ব্যবহার হয় ধ্বংস করার জন্যে আর ভূমিকম্পে পুরো শক্তিটা খরচ হয় মাটি পাথর নাড়া চাড়া করার জন্যে। ভূমিকম্পের বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্পে অযত্নে তৈরি করা দালানকোঠাগুলো ধ্বসে পড়ে ক্ষতি করতে পারে কিন্তু বড় রকমের ঝুঁকি নেই।

রিখটার স্কেলে এক মাত্রা বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কাঁপন বেড়ে যাওয়া দশগুণ, শক্তি বেড়ে যাওয়া ত্রিশগুণ (পদার্থ বিজ্ঞানের মানুষজনের একটু ভুরু কুঁচকানোর কথা) কাজেই রিখটার স্কেলে ছয় মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে তিরিশটা পারমানবিক বোমা– এবং আমি নিজে যেহেতু এরকম একটা ভূমিকম্প দেখেছি, আমি জানি এটা সত্যিকার ভূমিকম্প। 1960 সালে মরক্কোতে 5.9 মাত্রার একটা ভূমিকম্পে চৌদ্দ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল– ঘনবসতি এলাকায় এরকম হতে পারে। আমি প্যাসাডিনায় যেটা দেখেছিলাম সেটি একই আকারের কিন্তু মানুষ মারা গিয়েছিল মাত্র আটজন। ঢাকায় যদি ৬ মাত্রার একটা ভূমিকম্প হয় তাহলে কতো মানুষ মারা যাবে? আমি সেটা চিন্তাও করতে চাই না।

বিশেষজ্ঞদের ভাষায় 6.0 মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে শক্তিশালী ভূমিকম্প (strong)। সেটা যদি আরও ১ বেড়ে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সত্যিকারের বড় ভূমিকম্প (এক হাজারটা নিউক্লিয়ার বোমা!) ৭ মাত্রার ভূমিকম্প যে কী ভয়ানক হতে পারে তার উদাহরণ হচ্ছে এই বছরের জানুয়ারি মাসে হাইতির ভূমিকম্প। যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে তার জনসংখ্যা বিশ লক্ষ, ভূমিকম্পে দুই লক্ষ মানুষ মারা গেল। শহরের দশ শতাংশ মানুষ। খোদা না করুক কখনো যদি আমাদের দেশে– বিশেষ করে ঢাকা শহরে এরকম একটা ভূমিকম্প হয় তাহলে একই রকম ব্যাপার ঘটতে পারে। আমি এটা হিসেব করেও দেখতে চাই না।

৩.

আমাদের বাংলাদেশে 5 মাত্রার কাছাকাছি একটা ভূমিকম্প হওয়ার পর অনেককেই বলতে শুনেছি এখানে একটা বড় ভূমিকম্প আসছে– আমার মনে হয় এটা দায়িত্বশীল বক্তব্য নয়। ক্যালিফোরনিয়ার লস এঞ্জেলস্ এলাকায় রিখটার স্কেলে আটের কাছাকাছি একটা ভূমিকম্প যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে আমি সেটা 1984 সালে শুনেছি। আমি সেই এলাকায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাঁচ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বছর কাটিয়ে দিয়েছি, সেই ভূমিকম্পটি হয় নি। তারপর সিকি শতাব্দী পার হয়ে গেছে এখনও সেটি ঘটে নি। কাজেই ভূমিকম্পের বেলায় কখনোই এরকম ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ভূমিকম্প হতে পারে– কোথাও কোথাও সম্ভাবনা বেশি কোথাও কম, এর চাইতে জোর দিয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অটোগ্রাফ

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন অটোগ্রাফের ব্যাপারটা জানতামই না। যখন ক্লাস সেভেন কিংবা এইটে পড়ি তখন বগুড়ায় বেগম সুফিয়া কামাল এসেছিলেন। আমরা মহা উৎসাহে তাকে দেখার জন্য স্টেশনে গিয়েছি, যখন ট্রেন এসেছে তখন আমাদের আক্কেল গুড়ুম। স্টেশন বোঝাই অসংখ্য মানুষ এবং বাচ্চা কাচ্চা, যার জন্যে এতো উত্তেজনা সেই বেগম সুফিয়া কামাল থার্ড ক্লাশের একটা বগীতে করে চলে এসেছেন! (তখন ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস আর থার্ড ক্লাস ছিল!) বেগম সুফিয়া কামালের নজরে পড়ার জন্যে আমাদের ভেতর নানা রকম কম্পিটিশান শুরু হয়ে গেল- আমি তার একটা বিশাল ছবি এঁকে সবাইকে টেক্কা দিয়ে ফেললাম। সেই ছবি মঞ্চের উপর টানানো হল এবং গর্বে আমার ছোট বুকটা একশ হাত ফুলে গেল! তাকে নিয়ে আমাদের এতো উত্তেজনা কিন্তু আমার একবারও তার একটা অটোগ্রাফ নেবার কথা মাথায় আসে নি। (লোকজন শুনে হাসাহাসি করতে পারে আমি তার অটোগ্রাফ নিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরে– যখন আমার বয়স চল্লিশ!)

আজকাল আমাকেও অটোগ্রাফ দিতে হয়। যারা অটোগ্রাফ নেয় তাদেরকে অনেকে অটোগ্রাফ শিকারী বলে– আমি শব্দটা পছন্দ করি না। আমি খুব আনন্দের সাথে অটোগ্রাফ দিই এবং যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অটোগ্রাফ নেয়, তাদেরকে মোটেও হিংস্র শিকারীর মতো মনে হয় না। তবে অটোগ্রাফ দেবার বেলায় লেখকদের একটু সতর্ক থাকা দরকার, কখনোই ধরে নেয়া উচিৎ না যে পাঠক মাত্রই তার বইয়ে লেখকের একটা অটোগ্রাফ চান। ফেব্রুয়ারি বই মেলায় আমি একবার অত্যন্ত বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। পাঠক বই কিনেছেন, লেখক বইয়ের স্টলে বসে আছেন, তিনি স্মিত হাসি হেসে বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। পাঠক তখন মহা খ্যাপা হয়ে চিৎকার করে বলল,

www.BanglaBook.org

'আপনি কেন আমার বইয়ে অটোগ্রাফ দিলেন? আমি কি আপনার অটোগ্রাফ চেয়েছি?'

লেখক আমার পরিচিত তাই তাকে লজ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্যে কিছু দেখিনি কিছু শুনিনি এরকম ভান করে দ্রুত সরে পড়লাম।

যারা অটোগ্রাফ চায় তারা সাধারণত একটা অটোগ্রাফ পেলেই খুশি। মাঝে মাঝে কেউ চলে আসে যারা সাথে আরও কিছু চায়। যেমন একবার একজন এসে বলল, 'স্যার লিখে দেন প্রিয় জরিনা, আলতাফ মিয়া তোমার হরিণ কালো চোখে ডুব দিতে চায়। তারপর নিচে অটোগ্রাফ দিয়ে দেন। তারিখটা দেবেন এক সপ্তাহ পরের। তখন তার জন্মদিন। জন্মদিনে এই বইটা তাকে গিফট করব।'

আমি মাথা চুলকে বলি, 'এক সপ্তাহ পরে যদি বেঁচে না থাকি? তা ছাড়া জরিনার চোখ হরিণ কালো কী না সেটাও তো জানি না, আলতাফ মিয়ার সেখানে ডুব দেয়ার চেষ্টা করাটা ঠিক কাজ হবে কী না সেটাও তো বুঝতে পারছি না!' আলতাফ মিয়া আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হল এবং খানিকক্ষণ গাঁইগুই করে আমাকে রাজী করতে না পেরে শুকনো একটা অটোগ্রাফ নিয়ে মুখ কালো করে বিদায় হল।

কেন একজন আরেকজনের অটোগ্রাফ নেয় আমি সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি তার কারণ আমি নিজেও মাঝে মাঝে অটোগ্রাফ নিয়েছি। 'শিওরলী ইউ আর জোকিং মিস্টার ফাইনম্যান' নামে একটা অসাধারণ বই আছে। বইটি লিখেছেন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া রিচার্ড ফাইনম্যান, আমি যখন ক্যালটেকে কাজ করি তখন তিনি সেখানে ছিলেন আমি তার থেকে একটা বইয়ে অটোগ্রাফ নিয়ে রেখেছিলাম। তখন যদি কেউ আমার কাছে বেড়াতে আসত আমি তাদেরকেও তাঁর অটোগ্রাফ দেয়া বই উপহার দিতাম। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে একটা কথা চালু আছে সেই কথাটা চালু করেছিলেন হার্বার্ট সাইমন নামে একজন নোবেল বিজয়ী, আমার ছেলের একটা বিজ্ঞানের বইয়ে তার অটোগ্রাফ নিয়েছি। রুডলফ মস্বাওয়ার নামে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী আছেন যিনি তার পিএইচডি থিসিসের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, আমি যে গ্রুপে কাজ করতাম সেই গ্রুপের সাথে তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। আমি তার কাছ থেকেও বিশাল একটা বইয়ে অটোগ্রাফ নিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নিজেদের নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনূসের শুধু অটোগ্রাফ নয়– তার লেখা চিঠিও আমার কাছে আছে। কাজেই কেন একজন

www.BanglaBook.org

আরেকজনের অটোগ্রাফ নেয় আমি সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারি– তার পুরোটা যে বুঝতে পারি তা নয়। একটা উদাহরণ দিই।

একবার গনিত অলিম্পিয়াডে গিয়েছি সেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। দুপুরের ছোট একটা বিরতিতে সবাই আমার অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ঝাপিয়ে পড়েছে। তাদেরকে সামলানোর জন্য আমি শেষ পর্যন্ত দুটি লাইন করে দিলাম, একটি ছেলেদের আরেকটি মেয়েদের। লম্বা লাইন তার মাঝেই সবাই ধৈর্য্য ধরে দাড়িয়ে অটোগ্রাফ নিচ্ছে। দশ বারো বছরের একটা মেয়ের ডাইরিতে অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সেখানে আমার একাধিক অটোগ্রাফ রয়েছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি তার মাঝে একটি অটোগ্রাফে আজকের তারিখ। তার মানে সে এই লাইনে দাঁড়িয়ে একটু আগে একটা অটোগ্রাফ নিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আবার লাইনের পিছনে দাঁড়িয়েছ?' সে মাথা নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আরেকটা অটোগ্রাফের জন্য?' সে আবার মাথা নাড়ল। আমার কী একটা সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অটোগ্রাফ নিয়ে আবার তুমি লাইনের পিছনে দাঁড়াবে?' সে আবার মাথা নাড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' মেয়েটিকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল আমি বুঝতে পারলাম কারণটি তার জানা নেই। এটি মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমি আগেও দেখেছি আমরা যে সব কাজকর্ম করি তার অনেক কিছুই কেন করি সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। মেয়েটি কথা বলতে পছন্দ করে না মাথা নেড়ে উত্তর দেয় তাই তাকে আর বেশি প্রশ্ন করলাম না তার ডাইরিতে এক সাথে অনেকগুলো অটোগ্রাফ দিয়ে দিলাম। সে তারপরেও আবার লাইনের পিছনে দাড়িয়েছিল কী না জানা নেই!

লেখকেরা যখন বই মেলায় যান তখন তারা কোনো একটা প্রকাশকের স্টলে বসেন, আমি কখনো সেটা করি না। স্টলের ঘুপচি ঘরে বসার থেকে বটতলার বিশাল খোলা জায়গায় বসতে আমার খুব ভাল লাগে। বসে বসে মানুষজন দেখা খুব মজার একটা ব্যাপার– প্রত্যেকটা মানুষ ভিন্ন, তাদের হাব-ভাব ভিন্ন, কথা বলার ভঙ্গী চলাফেলা সবকিছু ভিন্ন দূর থেকে দেখতে খুব ভালো লাগে। সবসময় যে একা বসে থাকতে পারি তা না, মাঝে মাঝে আঁতেল টাইপের কোনো একজন একেবারে গা ঘেঁষে বসে বড় বড় বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করে দেয়।

একবার সে রকম ভাবে বসে একজন আঁতেলের কথা শুনছি, সামনে বেশ কিছু কমবয়সী ছেলেমেয়ের জটলা, তাদের অটোগ্রাফ দিচ্ছি। আতেল কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে বলতে হঠাৎ বলে বসল, 'বুঝলেন স্যার? আসলে বাংলাদেশ হওয়ার দরকার ছিল না। পাকিস্তানই ভালো ছিল!'

ব্যাস– আর যায় কোথায়! সামনে যারা দাড়িয়েছিল তারা ক্ষেপে উঠল, চিৎকার হইচই– 'ব্যাটা তোর কতো বড় সাহস, তুই একুশের বই মেলায় বসে বলিস পাকিস্তান ভালো ছিল?' কিছু বোঝার আগে দেখি সবাই মিলে আঁতেলকে টেনে নামিয়েছে তারপর দলবেধে আক্ষরিক অর্থে ঘাড় ধরে তাকে বইমেলা থেকে বের করে দিয়ে এসেছে।

এরকম অভিজ্ঞতা আরো আছে। বটতলায় বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছি, পাশে আমার স্ত্রী ইয়াসমীন। সামনে ছোট বড় অনেকে ছেলেমেয়ে অটোগ্রাফ নিচ্ছে, হঠাৎ করে শুনি ইয়াসমীন তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠেছে 'এই যে– এই যে সাদা শার্ট–'

সাদা শার্ট মানুষটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আমার স্ত্রী নেমে গিয়ে মানুষটাকে পাকড়াও করল, হুংকার দিয়ে বলল, 'তোমার এতো বড় সাহস? তুমি ভেবেছ কী? তুমি ভেবেছ কী আমি দেখি নি তুমি কী করেছ?'

মানুষটি একটা মেয়ের পিছনে দাড়িয়ে তার ঘাড়ে চুমু খেয়েছে। বিব্রত মেয়েটি সরে যাবার পর ইয়াসমীন তাকে ধরেছে। পাবলিক পারলে তখনই তাকে গণ-ধোলাই দেয়, কোনোমতে উদ্ধার করে কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে পুলিশ র‍্যাবের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে এল। কয়দিন হাজতের ভাত খেয়ে সে নিশ্চয়ই ছাড়া পেয়ে আবার ভীড়ের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে পিছন থেকে অন্যকোনো মেয়ের ঘাড়ে ড্রাকুলার মত দাঁত বসানোর জন্য। বজ্জাত কোথাকার!

বই মেলায় অটোগ্রাফ দেবার সময় আমি মাঝে মাঝে বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে হালকা আলাপ করার চেষ্টা করি। সেটা মাঝে মাঝে ব্যুমেরাং হয়ে ফেরৎ আসে– অনেক উদাহরণ আছে তার মাঝে একটি এরকম। কমবয়সী একটি মেয়ে বয়স্ক একজন মানুষের সাথে অটোগ্রাফ নিতে এসেছে। অটোগ্রাফ দিতে দিতে আমি বললাম, 'আব্বুর সাথে বই মেলায় এসেছ তাই না?' মেয়েটা বলল, 'আব্বু না। আমার হাজব্যান্ড।' আমি জীবনে এরকম অপ্রস্তুত হয়েছি বলে মনে হয় না। কান ধরে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখনো হালকা আলাপের চেষ্টা করব না।

অটোগ্রাফ শুধু যে প্রিয় মানুষ, প্রিয় লেখক, প্রিয় শিল্পী বা খেলোয়ারের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে তা নয়, এর মাঝে যে খানিকটা অর্থনৈতিক বিষয়ও

www.BanglaBook.org

থাকতে পারে সেটাও আমি একবার আবিষ্কার করেছিলাম। আমার একজন সহকর্মীর বিয়েতে গিয়েছি সেখানে অনেক মানুষ, তার মাঝে ছোট একটা বাচ্চা ছুটে এসে একটা কাগজে আমার অটোগ্রাফ নিয়ে গেল। একটু পর সে আবার হাজির, এবার তার হাতে একটা বিজনেস কার্ড, সে বিজনেস কার্ডের পিছনে অটোগ্রাফ নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আবার হাজির হল, এবার তার হাতে বেশ কয়েকটা বিজনেস কার্ড, আমাকে সবগুলোর পিছনে অটোগ্রাফ দিতে হল। কিছুক্ষণ পর সে আবার হাজির আরো কয়েকটা বিজনেসকার্ড নিয়ে- এভাবে কয়েকবার হবার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার? তুমি কী করছ?' সে গলা নামিয়ে চোখ টিপে বলল, 'দশ টাকা করে বিক্রি করছি!' এইটুকু বাচ্চারা এই ব্যবসা বুদ্ধি দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। বড় হলে সে নির্ঘাত বিল গেটস হবে।

বই মেলার ছোট দুটি ঘটনা বলে শেষ করি। ছোট একটি বাচ্চা বড় একটা বই নিয়ে আমার কাছে এসেছে অটোগ্রাফ নেবার জন্য। আমার কী মনে হল ভাবলাম একটু ঠাট্টা করি। বাচ্চাটাকে বললাম, 'অটোগ্রাফ নিতে দুই টাকা লাগে। তোমার কাছে দুই টাকা আছে?' ছোট বাচ্চাটা খানিকক্ষণ শীতল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঠোঁট উল্টে বলল, 'চাইনা আমার অটোগ্রাফ।' তারপর সে হেঁটে চলে গেল– আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এনে কোনোমতে তাকে শান্ত করে তার বইয়ে অটোগ্রাফ দিলাম!

এরকম আরেকবার একজন মা তার ফুটফুটে বাচ্চাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছেন, বাচ্চার হাতে একটা বই। মা আমাকে অনুরোধ করলেন তার বাচ্চার বইয়ে একটা অটোগ্রাফ দিতে– আমি বইটি নিয়ে অটোগ্রাফ দিয়ে বইটি বাচ্চার হাতে ফেরৎ দিয়েছি। বাচ্চাটা অটোগ্রাফ দেওয়া পৃষ্ঠাটি এক নজর দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল, চিৎকার করে বলল, 'আমার এতো সুন্দর বইটা নষ্ট করেরা দিছে!'

আমি যতটুকু অপ্রস্তুত মা বেচারী তার থেকেও বেশি অপ্রস্তুত! যারা লেখক তাদের সবাইকে কম বেশি কিছু অটোগ্রাফ দিতে হবে– কিন্তু একটু সাবধান থাকা ভাল। কিছু কিছু অটোগ্রাফ নিশ্চিত ভাবেই ব্যুমেরাং হয়ে ফেরত আসবে।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধন্যবাদ মোরশেদুল ইসলাম

বহুদিন সিনেমা হলে বসে ছবি দেখিনি তাই ভুলেই গিয়েছিলাম যে ছবি শেষ হবার পর হলে আলো জ্বেলে দেয়া হয়। এমনিতে সেটি কোনো সমস্যা হবার কথা নয় কিন্তু সেদিন আমি বেকায়দায় পড়ে গিয়েছি, কারণ ছবির শেষ দৃশ্যের কারণে আমার চোখে পানি এবং আমি সেটা মোছার সময় পাই নি তার আগেই হলে বাতি জ্বলে উঠেছে। নিজেকে আড়াল করে বের হওয়ার চেষ্টা করছি তখন একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে থামালেন সৌজন্যমূলক দুই একটি কথা বলে তিনিও আমাকে জানালেন ছবিটি দেখে তার চোখেও পানি এসেছে। আমি আরেকটু এগিয়ে এসে একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম। দুই বোন একজন আরেকজনকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে। কাছেই বাবা মা বিব্রত মুখে দাড়িয়ে আছেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

আমি মেয়েদুটির মাথায় হাত রেখে বললাম, 'কাঁদার কিছু নেই। পুরো গল্পটা বানানো, সত্যি সত্যি কেউ মারা যায় নি।' কথাটি আমি জোর দিয়ে বলতে পারছিলাম কারণ যে বইটিকে চলচিত্রে রূপ দেয়া হয়েছে সেটি আমার লেখা, একটি বই, বইয়ের নাম, আমার বন্ধু রাশেদ। আমার কথায় অবশ্যি কোনো কাজ হল না, মেয়ে দুটি একজন আরেকজনকে ধরে কাঁদতেই থাকল।

একাত্তরের উপর ভিত্তি করে লেখা এই বইয়ের চরিত্র, সংলাপ, ঘটনাগুলো কাল্পনিক হলেও একাত্তরের সেই মুক্তিযুদ্ধ তো কাল্পনিক নয়। রাশেদ নামে একাত্তরে আমার কোনো বন্ধু মারা যায় নি কিন্তু অন্য নামের অনেক বন্ধু তো যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে। এই চলচ্চিত্রের নৃশংস পাকিস্তানী মিলিটারী তো সত্যিই ছিল, তাদের প্রায় এক লক্ষ আত্মসমর্পন করে শেষে বিচার ছাড়াই পাকিস্তানে ফিরে গেছে। চলচ্চিত্রের রাজাকারদের কথা আমরা সবাই জানি, তাদের কেউ কেউ এখন ধরা পড়েছে, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার হবে। দেশের

www.BanglaBook.org

সাধারণ মানুষেরা তো সত্যিই একটা দুঃসহ অনিশ্চিত জীবনের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সত্যিই তো মানুষেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে শরনার্থী হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্যে সত্যি সত্যিই তো শিশু কিশোরেরা এগিয়ে এসেছিল, তাদের অনেকেই তো পাকিস্তান মিলিটারির হাতে মারা গিয়েছিল। এই সব কিছু নিয়ে প্রায় বিশ বৎসর আগে কী লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। চলচ্চিত্রটি দেখার সময় হঠাৎ করে পুরো একাত্তর যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বইয়ে আমি কতোটুকু পেরেছিলাম জানি না কিন্তু মোরশেদুল ইসলাম খুব যত্ন করে একাত্তরকে আমাদের চোখের সামনে তুলে এনেছেন। কলম দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও আমি যেটা বোঝাতে পারি না চলচ্চিত্রে পরিচালক এক ঝলকের একটা দৃশ্য দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারেন।

এই দেশে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পরিবার, সেই সময়ে পাকিস্তান মিলিটারি, রাজাকার আলবদরের হাতে স্বজন হারানো মানুষগুলো সবাই মিলে আড়ালে একটি বিশাল পরিবার। এই পরিবারের বন্ধন রক্তের বন্ধন থেকে কোনো অংশে কম নয় (তারা মরে গেলেও ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখে পাকিস্তান পাকিস্তান করে চিৎকার করতে পারবে না)। এই ছবিটি দেখে মনে হয়েছে মোরশেদুল ইসলাম একটি অসাধ্য সাধন করেছেন যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি, স্বজন হারানোর ব্যথা অনুভব করেনি সেই নূতন প্রজন্মও যেন এই চলচ্চিত্রটি দেখে এই দেশের সেই মুক্তিযোদ্ধা আর স্বজন হারানো পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছে।

ধন্যবাদ মোরশেদুল ইসলাম– এই দেশের শিশু কিশোরদের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! একাত্তরকে না দেখেও একাত্তরকে অনুভব করার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। স্বজনকে না হারিয়েও স্বজন হারানোর ব্যথা কত তীব্র হতে পারে সেটি অনুভব করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

২ মার্চ ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিজিটাল হটলাইন

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পুরো ব্যাপারটা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এক ধরনের বিভীষিকার মত। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়, ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রথমে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে ভর্তির ফর্ম নিতে হয়, আবার ঘুরে ঘুরে সেগুলো জমা দিতে হয়। যখন পরীক্ষার সময় হয় তখন আবার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা দিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের কষ্টের আর সীমা নেই।

দুই বছর আগে আমরা ভাবলাম ছাত্রছাত্রীদের সব কষ্ট তো আর কমাতে পারব না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তির ফর্ম নেয়া আবার জমা দেয়ার কষ্টটা তো কমাতে পারি। ছাত্র-ছাত্রীদের আসতে হবে না, বাড়িতে বসে মোবাইল ফোনে একটা এস.এম.এস পাঠিয়ে ভর্তির রেজিস্ট্রেশান করে ফেলবে। সত্যি কথা বলতে কী আমি বহুদিন থেকে এই পদ্ধতিটার কথা বলে আসছি কেউ আমার কথাকে গুরুত্ব দেয়না, হেসে উড়িয়ে দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলর আমার কথা শুনলেন, একাডেমিক কাউন্সিলকে রাজি করানো হল এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ভর্তির রেজিস্ট্রেশান হবে মোবাইল টেলিফোনে দেশে অনেকগুলো মোবাইল অপারেটর, রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি টেলিটককে। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর যখন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে বিষয়টা বললেন, তারা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সর্বনাশ! ওরকম পাগলামী করতে যাবেন না শেষে এমন অবস্থা হবে যে আপনাকে সুইসাইড করতে হবে!'

আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর তাদের কথা শুনে পিছিয়ে গেলেন না তাই আমরা কাজ শুরু করলাম। যেহেতু প্রথমবার আমাদের দেশে এরকম একটা

www.BanglaBook.org

কাজ করা হচ্ছে তাই আমরা ধরেই নিয়েছি অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকবে। সেই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেয়া যাবে সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করা হল বেশ কয়েকটি হট লাইন থাকবে যার প্রয়োজন হবে সে হট লাইনে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেবে। হট লাইনের পাঁচটা নম্বর নেয়া হল, প্রথম চারটি চারজন ভলান্টিয়ারকে দেয়া হল আমি পাঁচ নম্বরটি আমার নিজের কাছে রাখলাম– ছাত্রছাত্রীদের কী রকম প্রশ্ন থাকে সেটা জানার আমার একটু কৌতুহল ছিল!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই মোবাইল রেজিস্ট্রেশান পদ্ধতি উদ্বোধন করলেন এবং সাথে সাথে আমাদের হট লাইনগুলো বাজতে শুরু করল। আমরা প্রথমবার এমন একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম তার কোনো তুলনা নেই। যারা হট লাইনে ফোন করে তারা কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সবসময়ে প্রথমে প্রথম নম্বরটাতে ফোন করে, সেটা ব্যস্ত থাকলে দ্বিতীয়টা, সেটা ব্যস্ত থাকলে তৃতীয়টা– কাজেই যার কাছে প্রথম নম্বরটা ছিল সে মোটামুটি পাগল হয়ে গেল। তুলনামূলক ভাবে আমার ফোনটা বাজল কম তারপরেও সেটা আমাকে ব্যস্ত রাখল। যারা ফোন করতো তাদের কেউই জানতো না এটার উত্তর দিচ্ছি আমি তাই তারা ভদ্রতার ধার ধারতো না– যেমনভাবে খুশি সেভাবে কথা বলতে শুরু করত।

যেমন একদিন রাত দুটোর সময় ফোন বাজছে, আমি ঘুম ঘুম চোখে ফোনটা ধরে বলেছি, 'সাস্ট হট লাইন!' অন্যপাশ থেকে মানুষটি বলল, 'আমি ফোন করেছি হট লাইনটা চালু আছে কী না দেখার জন্যে। হট লাইন তো চব্বিশ ঘন্টা থাকার কথা।'

আমি বললাম, 'জী এটা চালু আছে!' মানুষটি তখন খট করে ফোনটা রেখে দিল।

যারা রেজিস্ট্রেশান করতো তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে একটা ফোন নম্বর দেবার কথা। প্রয়োজনে সেখানে আমাদের সার্ভার থেকে এস.এম.এস পাঠানো হতো। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীরা ভুল করতো– কাজেই আমাদের এস.এম.এস ও ভুল নম্বরে চলে যেতো। সেরকম একবার ভুল নম্বরে একটা এস.এম.এস গিয়েছে সেই মানুষটি মহা খাপ্পা হয়ে আমাকে ফোন করেছে। আমি তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ফল হলো উল্টো। আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আপনারা করেন? কী করেন? আপনারা কী মোবাইল প্রতারক? মোবাইল টেলিফোন দিয়ে মানুষদের প্রতারণা করেন? আপনাদের পুলিশে দেয়া দরকার। র‍্যাবে দেওয়া দরকার!' যন্ত্রণা আর কাকে বলে!

যখন এক সাথে অনেকে রেজিস্ট্রেশান করত তখন মাঝে মাঝে প্রক্রিয়াটা

www.BanglaBook.org

শেষ হতে একটু দেরী হতো। একবার সেরকম হয়েছে তখন একটা মেয়ে ব্যকুল হয়ে আমাকে ফোন করেছে, 'আমার রেজিস্ট্রেশান হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না!'

আমি বললাম, 'তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই হবে। আরেকবার চেষ্টা কর।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি আবার ফোন করল, বলল, 'হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'ভেরি গুড।'

মেয়েটা ঝংকার দিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'ভেরি গুড!! আমরা চার বান্ধবী এক সাথে রেজিস্ট্রেশান করার চেষ্টা করেছি যেন এক সাথে সিট পড়ে। অন্য তিনজনের ঠিকই একসাথে সিট পড়েছে– আমারটা হচ্ছে আলাদা। যত্তোসব–' আমাকে বিশাল ধমক দিয়ে মেয়েটি খট করে টেলিফোনটা রেখে দিল!

সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন নেই তারপরেও কেউ কেউ ফোন করে বসে থাকত! একদিন ফোন বেজেছে আমি ফোনটা ধরেছি, শুনলাম অন্য পাশ থেকে বলছে, 'ভাইয়া, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নটা কেমন হবে?'

আমি বললাম, 'পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন হবে সেটা তো বলা মুশকিল। প্রত্যেকবার যেরকম হয় সেরকম।'

'সেটাই তো জানতে চাচ্ছি! প্রত্যেকবারই তো আউল ফাউল প্রশ্ন হয়। এইবারও আউল ফাউল প্রশ্ন হবে?'

আমি এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব? তবে ছেলেটার সাথে কথা বলে আমার একটা লাভ হল, 'আউল ফাউল' বলে একটা নূতন কথা শিখে গেলাম। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনেকবার শব্দটা ব্যবহার করেছি।

তবে হট লাইনে আমার সব চাইতে মজার অভিজ্ঞতাটি এরকম। একদিন একজন ছাত্রের বাবা ফোন করে বললেন, 'আপনাদের সিস্টেম তো কাজ করছে না।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'আমার ছেলে রেজিস্ট্রেশান করেছে, কিন্তু আপনাদের সিস্টেম তাকে ভুল করে ভুল নামে রেজিস্ট্রেশান করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'অসমম্ভব! এটা কোনো ভাবেই হতে পারে না।'

'হয়েছে।'

আমার সামনে কম্পিউটার, আমি ইচ্ছে করলে ডাটা বেসে সবকিছু দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি। তাই ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনার ছেলের এইচ এস.সি রোল নম্বরটা বলেন দেখি।'

ভদ্রলোক রোল নম্বর বললেন, আমি ডাটাবেসে লিখতেই নাম ঠিকানা সবকিছু বের হয়ে এলো। আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখে বললাম, 'আপনার ছেলে কী অমুক?'

ভদ্রলোক নামটি শুনলেন। আমি শুনলাম তখন তিনি তার ছেলেকে উচ্চস্বরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তোর নামটা যেন কী?'

ছেলে নাম বলল, আমাদের ডাটা বেসে সেটা সঠিক ভাবেই আছে। বাবা ছেলের নাম জানে না সেটা হচ্ছে সমস্যা! এরকম বাবা নিশ্চয়ই এদেশে এরকম খুব বেশি নেই।

হট লাইনে এরকম অভিজ্ঞতার কোনো শেষ নেই– আমাদের ভলান্টিয়াররা ধৈর্য্য ধরে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে ভর্তি প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে শেষ করেছিল।

এখন প্রায় সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, এখনো আমরা ছাত্রছাত্রীদের সব কষ্ট শেষ করতে পারি নি। কিন্তু ভর্তি রেজিস্ট্রেশানের জন্যে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটাছুটি আর করতে হবে না। দেখে আমাদের ভালোই লাগে, মনে হয় ভাগ্যিস সাহস করে আমরা ব্যাপারটা শুরু করেছিলাম। তার থেকেও বড় কথা ভাগ্যিস হট লাইনে সবার প্রশ্নের উত্তর সবাই মিলে ধৈর্য্য ধরে দিয়েছিল!

তা না হলে শেষ পর্যন্ত কী হতো কে বলতে পারে?

দৈনিক ইত্তেফাক, ঈদসংখ্যা, ২০ আগস্ট ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ানোর সময়

আমি সিলেটে থাকি, মাঝে মাঝেই ঢাকায় যেতে হয়। পুরোনো একটা লক্কড়-ঝক্কড় মাইক্রোবাসে আমি ঢাকায় যাই। আমার ড্রাইভার, যে এখন আমার পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছে, খুব সাবধানে গাড়ি চালায়, কখনো কোনো ঝুঁকি নেয় না। তার পরও আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি, বিশাল দৈত্যের মতো বাস-ট্রাক প্রতি মুহূর্তে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করার জন্য আমাদের লেনে চলে আসছে, আর মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আমাদের নিজের লেন ছেড়ে রাস্তার পাশে নেমে যেতে হচ্ছে। একবার-দুবার নয়, অসংখ্যবার। ঢাকা পৌঁছানোর পর কিংবা ঢাকা থেকে সিলেটে পৌঁছানোর পর আমি আমার মাকে ফোন করে বলি, নিরাপদে পৌঁছেছি। আমার মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমাতে যান।

অনেক দিন ভেবেছি, ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা লিখি। তারপরই মনে হয়েছে, লিখে কী হবে। আমার মতো মানুষেরা, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করি, তাদের নিয়ে দেশের বড় বড় হর্তাকর্তার কতটুকু মাথাব্যথা আছে? দেশের মন্ত্রী আগে-পিছে পুলিশের গাড়ি নিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে যখন এই পথ দিয়ে যান, তাঁরা কি কখনো কল্পনা করতে পারেন দেশের এই রাস্তা কত বিপজ্জনক? একটিবার, শুধু একটিবার যদি আমি কোনো একজন মন্ত্রীকে আমার লক্কড়ঝক্কড় মাইক্রোবাসে বসিয়ে ঢাকা থেকে সিলেট কিংবা সিলেট থেকে ঢাকায় আনতে পারতাম, তাহলেই সবকিছু অন্য রকম হতে পারে!

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে গণিত অলিম্পিয়াডে সিলেট থেকে কুমিল্লায় যাচ্ছি। ভাড়া গাড়ি, ড্রাইভার অপরিচিত, আমি খুব সতর্ক হয়ে ড্রাইভারের প্রতিটি ওভারটেক, প্রতিটি মোড় লক্ষ্য করছি। কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করে

www.BanglaBook.org

সে সামনে আরেকটি বাস কিংবা ট্রাককে মেরে বসল। গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমার একজন সহকর্মী নিজের সিট থেকে উড়ে গিয়ে জানালার কাচে পড়েছেন। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো একটি গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছি আমাদের আহত সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য। দামি পাজেরো গাড়ি গতি কমিয়ে দুর্ঘটনায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া গাড়িটাকে একনজর দেখে হুশ করে বের হয়ে যায়, থামে না। শেষ পর্যন্ত থামল একটা ট্রাক। ট্রাক ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে রক্তাক্ত সহকর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তখন একবার ভেবেছিলাম কিছু একটা লিখি। পরে মনে হলো, কী হবে লিখে? প্রতিদিন কত মানুষ দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে, আমরা তো শুধু আহত হয়েছি!

গত বছর জুলাইয়ের শেষে আরিচার রাস্তায় দুর্ঘটনায় রিজিয়া বেগম আর সিদ্দিকুর রহমান মারা গেলেন। দুজনই অত্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সিদ্দিকুর রহমান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে আরেকটা দুর্ঘটনায় তাঁর দুজন মেয়ে মারা গিয়েছিল। রিজিয়া বেগমকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। গণিত অলিম্পিয়াড যখন শুরু হয়, তখন রাজবাড়ীতে একটা অলিম্পিয়াডে তিনি এসেছিলেন। বিটিসিএল-এর বোর্ড মিটিংয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক মিটিং করেছি। যখন শুনতে পেয়েছিলাম একজন রিজিয়া বেগম মারা গেছেন, তখন মনে মনে দোয়া করেছি যেন অন্য কোনো রিজিয়া বেগম হয়। কিন্তু আমার দোয়া কাজ করেনি। খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখে বুকটা ভেঙে গিয়েছিল। কী ভয়ংকর একটি দুর্ঘটনা! মনে হলো খবরের কাগজে একটু লিখি। তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে বলেছি, কী হবে লিখে? আমি এই দুজনকে চিনি বলে কষ্ট পেয়েছি। প্রতিদিন যে কত শত মানুষ মারা যাচ্ছে, তাদের আপনজনেরা কষ্ট পাচ্ছে, তখন কি আমি তাদের নিয়ে কিছু লিখেছি? সেই মৃত্যুগুলো কি শুধু একটা পরিসংখ্যান নয়?

জুলাই মাসের ১১ তারিখে মিরসরাইয়ে ট্রাক উল্টে ৪০ জনের বেশি বাচ্চা মারা গেল। কোনো মৃত্যুকেই কেউ কখনো গ্রহণ করতে পারে না, আর সেই মৃত্যু যখন হয় একটি শিশু কিংবা কিশোরের– তখন সেটি মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। আর সে রকম মৃত্যু একটি দুটি নয়, ৪০টির বেশি। আমার অনেক বড় সৌভাগ্য, আমার টেলিভিশন নেই! যদি থাকত তাহলে টেলিভিশনে স্বজন হারানো কান্না দেখে, ফুটফুটে বাচ্চাগুলোর নিথর দেহ দেখে আমি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে যেতাম। খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলো দেখে

www.BanglaBook.org

আমার বুক ভেঙে গেছে আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশ হলে সেই দেশের যোগাযোগমন্ত্রী নিশ্চয়ই পদত্যাগ করতেন। সরকার টালমাটাল হয়ে যেত। আমাদের দেশে কিছুই হলো না। এই দেশ ৪০টি কিশোরকে ধীরে ধীরে ভুলে গেল। ভাবলাম, পত্রিকায় নিজের ক্ষোভটা লিখি– তার পরই মনে হলো, কী হবে লিখে?

আগস্টের ২ তারিখ ভোরবেলা আমার ফোন বেজে উঠেছে, আমার একজন সহকর্মী নরসিংদী বাস অ্যাকসিডেন্টের ভেতর থেকে ফোন করেছে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'স্যার, চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ!' না, কোনো শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, একজন রিকশাওয়ালা আমার সহকর্মীকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বের করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তাকে বসিয়ে বলেছে, আমি যাই, অন্যদের নিয়ে আসি।' আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রীদের দেখে (কিংবা নৌপরিবহন মন্ত্রী কিংবা অন্য মন্ত্রী) যখন আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, ঠিক তখনই আমরা দেখি, এই রিকশাওয়ালার মতো মানুষজন চারপাশে আছে বলেই দেশটি টিকে আছে। মন্ত্রী মহোদয়রা এই দেশটিকে ধরে রাখেন না– এই রিকশাওয়ালার মতো মানুষেরা দেশটাকে বুক আগলে ধরে রাখেন। আমার সহকর্মীকে ঢাকার হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করার সময় খবর পেলাম ১৬ জন মারা গেছে। অন্য সব দুর্ঘটনার মতো এটাও মুখোমুখি সংঘর্ষ। আমার মনে হলো, কিছু একটা লিখি। আবার মনে হলো, কী হবে লিখে? সেই একই দিনে একই রাস্তায় অন্য একটি দুর্ঘটনায় আরও একটি পরিবার শেষ হয়ে গেছে, আমি কি তাদের নিয়ে দুর্ভাবনা করেছি? করিনি। স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের আপনজনের কথা লিখব?

আগস্টের ১৩ তারিখ একটা আনন্দানুষ্ঠানে বসে আছি। তখন একটা এসএমএস এল, গাড়ি দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদ মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় আহত হলে যত কমই হোক, কিছু একটা আশা থাকে–'মারা গেছে' কথাটি এত নিষ্ঠুর সবকিছু শেষ। আমার পাশে আমার স্ত্রী বসে ছিল। তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ আমাদের বহুদিনের পরিচিত, সেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসজীবন থেকে। তাকে খবরটা দিতে হবে– আমি তবু চুপচাপ বসে রইলাম। যদি পাঁচ মিনিট পরও দিই, তাহলে সে মানুষ পাঁচ মিনিট পরে কষ্ট পাবে!

আমি প্রতিদিন অনেকগুলো খবরের কাগজ পড়ি। তারেক মাসুদের মৃত্যুর পরের দিন আমি খবরের কাগজগুলো পড়তে পারিনি। ভাঁজ করে সরিয়ে রেখেছি। যেন খবরের কাগজ সরিয়ে রাখলেই কষ্টটা সরিয়ে রাখা

www.BanglaBook.org

যায়। আমার মনে হলো, কিছু একটা লিখি। প্রথমবার আমি লিখতে বসেছি– কী লিখব? একটি কথাই লেখার আছে, যদিও আমি প্রতিটি ঘটনার সময় 'দুর্ঘটনা' শব্দটি ব্যবহার করেছি। আসলে এর একটিও কিন্তু দুর্ঘটনা নয়, প্রতিটি এক ধরনের হত্যাকাণ্ড।

২.

আমরা যে পাকিস্তানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের দেশকে স্বাধীন করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমি প্রতিদিন যখন খবরের কাগজ খুলি, তখন চোখে পড়ে পাকিস্তানের কোথাও না কোথাও কোনো জঙ্গি, কোনো তালেবান বোমা মেরে ৩০–৪০ জন মানুষকে মেরে ফেলেছে। পাকিস্তান নামক এই দুর্ভাগা দেশটিকে দেখে এখন আমার করুণা হয়।

আমাদের দেশে জঙ্গিদের উৎপাত নেই। খবরের কাগজে জঙ্গিদের খবর আসে না তা নয়; কিন্তু সেগুলো হচ্ছে তাদের ধরার খবর। এই দেশের মানুষ জঙ্গি বা মৌলবাদকে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি, কখনো দেবে না। এই দেশে জঙ্গিদের হাতে প্রতিদিন ৩০–৪০ জন মানুষ নৃশংসভাবে মারা যায় না।

কিন্তু প্রতিদিন দুর্ঘটনায় ৩০–৪০ জন মারা যায়। তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কী থাকল? খবরের কাগজে মৃত্যুর খবরটা পরিসংখ্যান হিসেবে দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কখনো খেয়াল করি না যে প্রতিটা মৃত্যুই আসলে কোনো না কোনো পরিবারের আপনজন হারানোর হাহাকার। সেই হাহাকারগুলো কত মর্মান্তিক হতে পারে, সেটা আমরা তারেক মাসুদ কিংবা মিশুক মুনীরের মৃত্যু দিয়ে বুঝতে পারি। দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি মারা যায় দেশের সাধারণ মানুষ। একেকটি মৃত্যুতে একেকটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। যারা আহত হয়ে বেঁচে থাকে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে গিয়ে একেকটি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এই দেশের অর্থনীতির ওপর এর চাপ নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু মানবিক বিপর্যয়ের কথাটি কি কেউ ভেবে দেখবে না?

৩

নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান কিছুদিন আগে কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই ২৪ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স চেয়েছেন। তিনি নৌপরিবহনমন্ত্রী, যদি লঞ্চের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সারেং চাইতেন, আমি বুঝতে পারতাম। রাস্তায় গাড়ি চালানোর ডাইভার চাওয়ার অধিকার তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। বিষয়টা অনেকটা অশিক্ষিত ২৪ হাজার মানুষকে স্কুলের মাস্টার করে দেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবদার করার মতো। (তিনি সম্ভবত যুক্তি দিতে পারতেন, মাস্টারদের লেখাপড়া জানতে হবে কে বলেছে? বইয়েই তো সব লেখা আছে, মাস্টাররা ছাত্রদের পেটাবে, ছাত্ররা পড়বে!)

নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের কথায় দেশের মানুষ অসম্ভব বিরক্ত হয়েছে– পত্রপত্রিকা খুললে কিংবা কম্পিউটার স্পর্শ করলেই সেটা বোঝা যায়। আমি কিন্তু তাঁর কথায় খুব খুশি হয়েছি দুই কারণে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, যে কথাটা দেশের মানুষকে বোঝাতে আমাদের জান বের হয়ে যেত, সেই কাজটি মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জন্য খুব সহজ করে দিয়েছেন। আমরা এখন তাঁর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলতে পারি, এটাই হচ্ছে সমস্যা! একজন মন্ত্রী যদি বিশ্বাস করেন যে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িকে ডানে-বাঁয়ে নিতে পারাটাই হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা, তাকে নিয়ম কানুন কিছুই জানতে হবে না, গরু ও ছাগলের পার্থক্যটা জানলেই হবে, তাহলে আমরা কেন রাস্তা ঘাটের বাস-ট্রাকের ড্রাইভারদের দোষ দিই? তাদের বেশির ভাগই তো গাড়িটা চালাতে পারে, ট্রাফিক আইন কী, সেটা কেন মানতে হবে তার বিন্দুবিসর্গ জানে না, জানার প্রয়োজন আছে, সেটাও জানে না। যারা জানত তাদেরও মন্ত্রী মহোদয় বলে দিয়েছেন, আর জানার প্রয়োজন নেই।

বেশ কিছুদিন আগে আমি নামীদামি একটা বাস কোম্পানির দামি ভলভো বাসে করে যাচ্ছি। দেখতে পেলাম, বাস ড্রাইভার অন্য গাড়ি ওভারটেক করার জন্য একটু পর পর পাশের লেনে উঠে সামনের দিক থেকে ছুটে আসা গাড়িকে সরে যেতে বাধ্য করছে। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা আমার আর সহ্য হলো না, আমি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললাম, 'এই বাম দিকের লেনটি আপনার, আপনি এই লেন দিয়ে যাবেন। ডান দিকের লেনটি যারা আসছে তাদের জন্য। কাউকে ওভারটেক করার জন্য আপনি ডান দিকের লেনে উঠতে পারবেন শুধু যখন এটা ফাঁকা থাকবে তখন। এই লেনে যদি একটা মোটর সাইকেলও থাকে, আপনি তখন ওখানে উঠতে পারবেন না। বুঝেছেন?'

বাসের ড্রাইভার কিছুক্ষণ আমার দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল;

www.BanglaBook.org

তারপর বলল, 'স্যার, আমি এত বছর থেকে বাস চালাই, আপনার আগে আমাকে কেউ এই কথা বলে নাই!'

আমি এবার ড্রাইভারের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই হচ্ছে অবস্থা। আমাদের দেশে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৫০ জন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সৃষ্টিকর্তার এই দেশের জন্য একধরনের মায়া আছে, সেই জন্য সংখ্যাটি মাত্র ৩০ থেকে ৫০। প্রকৃত সংখ্যাটি হওয়ার কথা তার থেকে ১০ গুণ বা ১০০ গুণ বেশি। এই দেশে প্রতিমুহূর্তে কোনো না কোনো রাস্তায় দুটি গাড়ি মুখোমুখি ছুটে আসতে আসতে শেষ মুহূর্তে একবারে এক সুতো ব্যবধানে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে– পৃথিবীর আর কোথাও এত ভয়ংকরভাবে গাড়ি চালানো হয় না।

নৌপরিবহন মন্ত্রী বলেছেন, ড্রাইভারদের লেখাপড়া জানার দরকার নেই, গরু ও ছাগলের পার্থক্য জানলেই হবে! (কেন গরু আর ছাগল বলেছেন, সেটি এখনো রহস্য, যদি বলতেন বাস আর ট্রাকের পার্থক্য জানলেই হবে কিংবা ক্যাব আর টেম্পোর পার্থক্য জানলেই হবে, কিংবা রিকশা আর স্কুটারের পার্থক্যটা জানলেই হবে– তাহলেও একটা কথা ছিল।) মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন না গাড়ি চালানোর অন্তত দুই ডজন নিয়ম আছে, যেগুলো পড়ে শিখতে হয় (রাস্তায় কোন ধরনের চিহ্ন থাকলে কোন দিকে যেতে হয় ইত্যাদি)। অন্তত ৩০টা জরুরি আইন আছে, গতিসীমা লিখে দেওয়ার ব্যাপার আছে। যে মানুষটি লেখাপড়া জানে না এবং এই বিষয়গুলো না জেনে একটা ড্রাইভার লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে একজন সন্ত্রাসীর হাতে একটা ধারালো কিরিচ তুলে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমি এই কথাগুলো লিখছি এবং ভাবছি, কী বিচিত্র এই দেশ: একজন মন্ত্রী সম্পূর্ণ বেআইনি একটা বিষয়ের আবেদন করছেন এবং কেন তিনি সেটা করতে পারেন না, আমাকে সেটা লিখতে হচ্ছে! বেআইনি কাজ করা যদি অপরাধ হয়,তাহলে বেআইনি কাজ করার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া কি অপরাধ নয়?

আমি বলেছিলাম নৌপরিবহন মন্ত্রীর এই বেআইনি আবদার শুনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম দুটি কারণে। প্রথম কারণটি বলা হয়েছে, দ্বিতীয় কারণটি খুবই সহজ। এই মুহূর্তে নানা কিছু মিলিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার খুব ঝামেলার মধ্যে আছে। গায়ে পড়ে আদিবাসী বিতর্কটা উসকে দিয়েছে, রাস্তাঘাট ভাঙা, ঈদে বাড়ি যাওয়ার কোনো উপায় নেই, সড়ক

www.BanglaBook.org

দুর্ঘটনায় দেশের প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যু– সেই অবস্থায় নৌপরিবহন মন্ত্রীর উদ্ভট বক্তব্য। এই সরকার নিশ্চয়ই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে– অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও দেশের মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চাইছে। নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেই অপূর্ব সুযোগটি করে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন নৌপরিবহন মন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সারা দেশের মানুষের বাহবা পেতে পারেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যদি যোগাযোগ মন্ত্রীকেও সরিয়ে দেন, তাহলে তো কথাই নেই। ঈদের ছুটিতে যারা বাড়ি যেতে পারবে না কিংবা যারা বাড়ি যেতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে, অনন্ত তাদের বুকের জ্বালা একটু হলেও মিটবে।

খবরের কাগজে দেখছি, সবাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ঈদের উপহারটি চাইছে। আমার ধারণা, এটি আসলেই দেশের মানুষের জন্য চমৎকার একটা উপহার হতে পারে!

৪

সড়ক দুর্ঘটনা– কিংবা যদি ঠিক ঠিক বলতে চাই, তাহলে, 'সড়ক হত্যাকাণ্ড' আমাদের দেশের অনেক বড় একটা সমস্যা। আমার মতে সবচেয়ে বড় সমস্যা। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বছরে ১২ থেকে ২০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা সড়ক হত্যাকাণ্ডে মারা যায় বলে জানা নেই। প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে বিচলিত হই না। হঠাৎ করে তারেক মাসুদ বা মিশুক মুনীরের মতো কোনো প্রিয়জন যখন মারা যায়, আমরা তখন চমকে উঠি। যেদিন মানিকগঞ্জের সেই দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদ, মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন মারা গিয়েছিল, সেই খবরটির নিচে আরও একটি দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন মারা গিয়েছিল– সেই খবরটি কিন্তু আমাদের চোখেও পড়েনি। আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। সাধারণত এসব দুর্ঘটনায় সাধারণ খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষ মারা যায়, সেই মৃত্যুর কথা কারও চোখেও পড়ে না। তাই বছরে ১২ থেকে ২০ হাজার মৃত্যুর পরও কোনো সরকারের কোনো দিন টনক নড়েনি। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এই সরকারেরও টনক নড়বে না। যদি নড়ত, তাহলে যে দুজন মন্ত্রী দেশের মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন, তাঁরা নিজেরাই পদত্যাগ করে বিদায় নিতেন।

www.BanglaBook.org

সে রকম কিছু ঘটেনি। দেশের মানুষ শোকসভা, শোকমিছিল, মানববন্ধন করছে। আমি যে রকম খবরের কাগজে লিখছি, সে রকম কিছু অর্থহীন কথা লেখা হবে এবং একসময় সবাই ভুলে যাব।

কিন্তু এ রকম হতে হবে কে বলেছে? অন্য রকম কিছুও তো হতে পারে? বছরের পর বছর হাজার হাজার মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গেছে, লাখো মানুষ দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়েছে, আমরা কেউ গা করি না। ইলিয়াস কাঞ্চন একা নিরাপদ সড়ক চেয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াইনি। তারানা হালিমকে আমি সংসদে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলতে শুনেছি, পরীক্ষা ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে মানুষ হত্যা করার লাইসেন্স দেওয়া হলে তিনি আমরণ অনশন করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। অন্যরা কোথায়? সরকার যেহেতু কিছু করবে না, তাহলে দেশের মানুষ কি সবাই মিলে একত্র হতে পারে না? পত্রিকায় হালকা কলম লেখা বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞরা একত্র হতে পারেন না? ট্রাফিক আইন মানানোর জন্য পুলিশকে জোর করে হাইওয়েতে নামানো যায় না? একটা দুর্ঘটনা হলেই বাসমালিক, বাস ড্রাইভার, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়– সবার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না? আমি নিশ্চিত, সবাই মিলে একত্র হলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভীষিকাকে নিশ্চয়ই ঠেকানো সম্ভব।

মে মাসের শেষে আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। প্লেনে ওঠার সময় আমাদের ক্যাথরিনের সঙ্গে দেখা। ফুটফুটে বাচ্চাটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে তারেক মাসুদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিদেশি মেয়ে অথচ কী সুন্দর বাংলা বলে। বহুদিন থেকে তাকে আমরা আমার দেশের মানুষ হিসেবেই ধরে নিয়েছি। বাচ্চাটিকে আদর করে প্লেনে উঠেছি, একটু পর তারাও উঠেছে। তারেক মাসুদ পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেই আমার শেষ দেখা।

তারেক-ক্যাথরিনের ছোট্ট বাচ্চাটি একদিন বড় হবে। আমার খুব ইচ্ছে, তখন তাকে আমরা বলব, 'তুমি জানো, তোমার আব্বু ছিল অসম্ভব সুদর্শন একজন মানুষ! এই দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য তার বুকের মাঝে ছিল অসম্ভব ভালোবাসা। একদিন গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে সে তার প্রাণের বন্ধুদের নিয়ে মারা গেল। তখন সারা দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠে বলল, এই দেশে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে আর কাউকে মরতে দেওয়া হবে না। দেশের মানুষ তখন পুরো দেশটাকে পাল্টে দিল। এখন আমাদের দেশে আর গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মানুষ মারা যায় না!' আমরা তখন ছোট শিশুটির মাথায় হাত দিয়ে বলব,

www.BanglaBook.org

'তুমি তোমার আব্বুকে হারিয়েছ। কিন্তু তোমার আব্বুর জীবন দেওয়ার কারণে এই দেশের আর কোনো শিশুর আব্বু এভাবে মারা যায় না।'

আমার খুব ইচ্ছে, আমরা এই ছোট শিশুকে একদিন এই কথাগুলো বলি। সবাই মিলে চাইলে কি বলতে পারব না?

দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ আগস্ট ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গল্পগুচ্ছ : পাঠকের চোখে

গল্পগুচ্ছ ছোট গল্পের সংকলন এবং সবাই জানে একটা ছোটগল্প সবসময় পুরোটা পড়তে হয়, যিনি লিখেন তিনি প্রায় সময়েই গল্পের শেষে কিছু একটা রেখে দেন এবং সেটা পড়া শেষ হলেই পুরো গল্পটি শেষহয়। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি গল্পগুচ্ছের বেলায় সেটা পুরোপুরি সত্যি নয়, যে কেউ ইচ্ছে করলে গল্পগুচ্ছের যে কোনো গল্প যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করে যে কোনো অংশ পর্যন্ত পড়ে রেখে দিতে পারে! অন্যদের বেলায় এটা সত্যি কিনা জানি না কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ে এই বিচিত্র ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছি। হাতের কাছে গল্পগুচ্ছ থাকলে আমি মাঝখান থেকে খুলে এক জায়গা থেকে পড়তে শুরু করে দিই, পড়া গল্প, তাপরেও প্রত্যেকবারই দেখি একটা নূতন কিছু চোখে পড়ে, যতক্ষণ সময় থাকে পড়ি, পুরোটা শেষ হলে ভালো, শেষ না হলেও ক্ষতি নেই। আমার এই পড়াটুকু সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্যে নয়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ, তার রসবোধ কী ভয়ংকর রকম তীক্ষ্ণ এবং কী অসাধারণ ভাবে তিনি তার কথাগুলো বলেন আমি হতবাক হয়ে সেগুলো দেখি। মানুষ যেরকম অলিম্পিকে জিমনাস্টিকের কৌশলগুলো হা করে তাকিয়ে দেখে আমিও ঠিক সেরকমভাবে গল্পগুচ্ছের এক একটা বাক্য পড়ে হা করে তাকিয়ে থাকি। মানুষ কেমন করে এরকম প্রতিভাবান হয় কে জানে– ভাগ্যিস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা মা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে সন্তানদের সংখ্যা এক ডজন হয়ে যাবার পর থেমে যান নি!

আমি যেহেতু বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি তাই কোনো গল্প উপন্যাসে বিজ্ঞানের বিষয় থাকলে সেটা আলাদা ভাবে আমার চোখে পড়ে। আমি অন্য এক ধরনের আনন্দ অনুভব করি যখন দেখি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গল্প উপন্যাসে বিজ্ঞান নিয়ে আসছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজ্ঞানের শব্দগুলোর দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় গল্পগুচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু কখনো সেরকম কিছু করেন নি। অবলীলায় চৌম্বকীয় না লিখে ম্যাগনেটিজম লিখেছেন, রাসায়নিক না লিখে ক্যামিকেল লিখেছেন, অনুবীক্ষণ না লিখে মাইক্রসকোপ লিখেছেন। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য তার 'চোরাই ধন' নামের গল্পটি। সেখানে গল্প লেখক একজায়গায় তার মেয়ের ভালোবাসার মানুষটিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে তার কাছ থেকে 'কোয়ান্টাম থিওরিটা যথাসাধ্য' বুঝে নিতে চেয়েছেন। গল্পটি লেখা হয়েছে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে, হিসেব করলে সেটা হয় ইংরেজি ১৯৩৩ সাল। মজার কথা হচ্ছে ইংরেজী ১৯২৭ সালে হাইজেনবার্গ তার অনিশ্চয়তার সূত্র প্রকাশ করেছেন এবং মোটামুটি সেই সময় থেকে কোয়ান্টাম থিওরী দাঁড়া হতে শুরু করেছে এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে আরো সময় নিয়েছে। এখন না হয় ইন্টারনেট আছে, টেলিভিশন আছে, ব্লগ আছে, ই-মেইল আছে, জানতে না চাইলেও মানুষেরা জোর করে কিছু একটা জানিয়ে দেয়। আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ইউরোপে যখন কোয়ান্টাম থিওরী জন্ম নিতে শুরু করেছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন করে সেটার কথা এতো সহজ ভাবে জানলেন, এতো নিশ্চিন্তে তার গল্পে ব্যবহার করলেন?

তার লেখার একটা লাইনের সরাসরি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। 'শেষ কথা' নামের গল্পের এক জায়গায় আছে, 'যৌবনের গোড়ার দিকে নারী প্রভাবের ম্যাগনেটিজমে জীবনের মেরু প্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক, একেবারে কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক।' আমি বাজী ধরে বলতে পারি খুব কম সংখ্যক পাঠক এই বাক্যটির সঠিক অর্থ ধরতে পেরেছেন, কারণ এটা বুঝতে হলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম জানতে হয়! পৃথিবীর দুই মেরুতে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনে চার্জড পার্টিকেল আটকা পড়ে অরোরার বিচিত্র আলোয় খেলা তৈরি হয় এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি যারা জানে না তারা আসলে এই বাক্যটি ভালো করে বুঝতে পারবে না। বিজ্ঞানী না হয়েও কবি রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটুকু জানতেন! গল্পগুচ্ছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ল্যাবরেটরি নামে একটা গল্প আছে, দীর্ঘ এই গল্পে একটি প্রধান চরিত্র একজন বিজ্ঞানী এবং সেই বিজ্ঞানী 'পৌঢ় বয়সে কোন-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে' মারা গিয়েছিলেন। সত্যিকার বিজ্ঞানীরা সাধারণত সতর্ক থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মারা যান না তাই আমার সব সময়েই জানতে কৌতুহল হয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনায় সেই

www.BanglaBook.org

দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি কী ধরনের পরীক্ষা ছিল!

তবে কেউ যেন মনে না করে আমি যখন গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো পড়ি তখন সেখানে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের গন্ধ খুঁজে বেড়াই! তাঁর এক একটি গল্প এক এক রকম! কোনো কোনো গল্প ছেলেবেলায় পড়ে এতো কষ্ট পেয়েছিলাম যে বড় হয়েও সেটা দ্বিতীয়বার পড়তে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়! ছুটি গল্পটিতে যেহেতু লেখক পরিস্কার করে লিখেননি যে ফটিক মারা যাচ্ছে তাই আমি এখনও নিজেকে বোঝাই যে ফটিক যখন বলেছে তার ছুটি হয়েছে এবং সে বাড়ি যাচ্ছে তখন আসলেই তার ছুটি হয়েছে এবং সে বাড়ি যাচ্ছে। শুধু তাই নয় বাড়ি গিয়ে আবার নদী তীরে সে তার দলবল নিয়ে দুষ্টুমি করে বেড়াবে, ছোট ভাই মাখনের ওপর বিচিত্র উৎপাত করে বেড়াবে! লেখক দুঃখের কাহিনী লিখতেই পারেন, কিন্তু আমরা যারা দুর্বল মনের মানুষ তাদরেকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে কে বলেছে?

যে গল্পটি বাল্যবয়সে আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি এখনও আমাকে সমানভাবে শিহরিত করে সেটি হচ্ছে 'সম্পত্তি সমর্পণ'। ভয়ংকর সেই বুড়ো মানুষটি কীভাবে ছোট শিশুটিকে যক্ষ বানিয়ে মন্দিরের নিচে অন্ধ প্রকোষ্ঠে মাটি চাপা দিয়ে এসেছে তার বর্ণনাটি অবিশ্বাস্য। যক্ষ বানানোর একটা সুনির্দিষ্ট প্রেসক্রিপশান আছে আমি সেটি এই গল্প থেকে শিখেছি এবং গল্পটি পড়ার সময় পুরো প্রক্রিয়াটি আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। যে বংশধরের কাছে সমস্ত ধনদৌলত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বুড়ো মানুষটি একটি অবোধ শিশুকে যক্ষ বানানোর প্রক্রিয়াটি শেষ করেছে, সেই অবোধ শিশুটিই যে তার নিজেরই বংশধর সেই চমকটি পেয়েছিলাম প্রথমবার এবং বিষয়টি আমাকে হচকিত করে ফেলেছিল! আমাদের দেশের নাটকের দল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গল্পকেই নাটক বানিয়ে ফেলে, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মত গল্পকে নিয়েও চমৎকার নাটক তৈরি করতে দেখেছি, কাজেই আমি মনে মনে অপেক্ষা করে থাকি সম্পত্তি সমর্পণ নিয়ে একটি নাটক দেখার জন্যে। (কেন এখনো সেটা নিয়ে নাটক হয় নি সেটা অবশ্য আমি খানিকটা অনুমান করতে পারি– একটি শিশুকে দিয়ে যক্ষের অভিনয় করানো হয়তো খুব সহজ ব্যাপার নয়।)

গল্পগুচ্ছকে নিয়ে আমার ভেতরে একটি বেদনা বোধের জন্ম হয়েছে এবং যতই দিন যাচ্ছে সেই বেদনাবোধটি ততই তীব্রতর হচ্ছে। আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্পগুচ্ছের কোনো গল্প

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ে নি, পড়বে বলেও মনে হয় না। ভাষা কঠিন বলে তারা অভিযোগ করে। জোর করে এলজেবরা করানো যায়, জোর করে হয়তো ইংরেজি গ্রামারও পড়ানো যায় কিন্তু জোর করে কাউকে গল্পগুচ্ছের গল্প পড়ানো যায় না, যদিবা পড়ানো যায় উপভোগ করানো যায় না। তার অর্থ এই দেশের ছেলেমেয়েরা কখনোই গল্পগুচ্ছের সেই অবিশ্বাস্য বুদ্ধিদীপ্ত কথা, অসম্ভব তীক্ষ্ণ রসবোধ আর অসাধারণ প্রকাশ ভঙ্গীর কথা কোনো দিন জানবে না!

তাহলে তারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবে কীভাবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

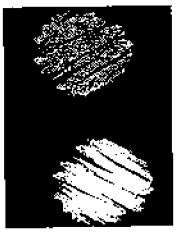

নূতন প্রজন্মের জন্যে রবীন্দ্রনাথ

আমি যখন মাত্র কথা বলতে শিখছি, লেখাপড়া শুরু করিনি তখনই আমার বাবা আমাকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন কবিতাটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি হাত পা নেড়ে কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারতাম কিন্তু কবিতাটির অর্থ তখনো কিছুই বুঝতাম না। কবিতার প্রথম লাইনটি ছিল।

'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বার বার–' আমি দূত শব্দটি তখনো শিখিনি, ধরে নিয়েছিলাম শব্দটি আসলে 'দুধ'। ভগবান কী তখনো জানি না, তবে মস্তিষ্ক খাটিয়ে বের করলাম দুধ পাঠায় যে সে নিশ্চয়ই গোয়ালা (বাসায় প্রতিদিন গোয়ালা দুধ দিয়ে যেতো তাকে আমি চিনি!) কাজেই আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম কবিতাটি ভগবান নামে একজন গোয়ালার দুধ বিতরণ সংক্রান্ত একটি কবিতা। তবে যে বিষয়টি আমি তখনো বুঝতে পারতাম না সেটি হচ্ছে কেন এই কবিতাটি আবৃত্তি করার সময় মুখে একটা গাম্ভীর্য্য ধরে রাখতে হবে। হাসি হাসি মুখ করে কেনো গোয়ালার দুধ বিতরণ করার কবিতা আবৃত্তি করতে পারব না। বাবার কাছে কখনো বিষয়টি খোলাসা করে জিজ্ঞেস করি নি! আমি একা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা শিখিনি, আমার বাবা আমাদের প্রত্যেক ভাই বোনকেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা করে কবিতা মুখস্থ করিয়েছিলেন।

এতোদিন পর বিষয়টি চিন্তা করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া আমার বাবার জন্যে এক ধরনের গভীর মমতা অনুভব করি। তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না একটি শিশু কবি বরীন্দ্রনাথের স্পর্শ ছাড়া বড় হবে! আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বড় হয়েছি– তার কবিতা পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়েছে, গল্প পড়ে চোখের পানি মুছেছি, উপন্যাস পড়ে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি, বিরামহীন ভাবে তার গান শুনেছি! প্রবন্ধ পড়ার জন্যে একটু বড় হতে হয়েছে, কিন্তু যখন পড়েছি তখন তার অসাধারণ রসবোধ

www.BanglaBook.org

আর চিন্তার গভীরতা দেখে হতবাক হয়েছি! একজন মানুষের ভেতর কেমন করে এতো ভিন্ন ভিন্ন ধারার প্রতিভা থাকতে পারে সেটি এখনো আমার কাছে রহস্য। আমি নিজেকে অসম্ভব সৌভগ্যবান একজন মানুষ মনে করি যে আমার বাবা ঠাকুরমার ঝুলি বা গোপাল ভাড়ের গল্প দিয়ে আমাকে সাহিত্যের জগতে পরিচয় করিয়ে দেন নি– আমাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে এই অপূর্ব জগতে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের নূতন প্রজন্ম আমাদের মত এতো সৌভাগ্যবান না। তাদের বেশির ভাগই বেশ দুর্ভাগা। তারা রবীন্দ্রনাথ পড়ে না এবং পড়তে চায়ও না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তাদের বড় অংশই সোজাসুজি বলে দেয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। যার অর্থ, পাঠ্য বইয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গল্প বা কবিতাটি রয়েছে তারা তার বাইরে তারা তার আর একটি লেখাও পড়বে না। বিষযটি আমার কাছে কেমন যেন আতংকজনক মনে হয়। বাঙালী ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের লেখা না পড়ে বড় হবে সেটি আমার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমার মনে হয় একজন মানুষ যদি রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি না পড়ে বড় হয় তাহলে সে কখনোই সম্পূর্ণ একজন বাঙ্গালী হিসেবে বড় হবে না। আমাদের দেশের নূতন প্রজন্ম অসম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে বড় হবে সেটি কেমন করে মেনে নিই।

আমি বিষয়টি নিজেদের ভেতরে আলোচনা করেছি, আমার পরিচিত বা সহকর্মীরা আমার সাথে একমত হয়েছেন, মাথা নেড়েছেন কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারেন নি। শুধু একজন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি সহজ চলিত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে নিতে– অনেক দেশেই নাকি এরকম প্রচলন আছে। আমি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ নই, আমি সাহিত্য উপভোগ করি তারপরও আমি বুঝতে পারি এটি মোটেও কাজের কথা নয়! কবিতায় ছন্দ কীভাবে কাজ করে আমি তার নিয়ম কানুন জানি না, কিন্তু যখন কোনো একটা কবিতা পড়ি তার ভেতরকার ঝংকারটুকু মাথার মাঝে গেঁথে যায়! যেমন আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা:

সংসার সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ ক্লান্ত তপ্ত বায়ে,
সারাদিন বাজাইনি বাঁশী ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লাগিছে কোথা কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি

পৃথিবীর কোন মানুষের দুঃসাহস আছে এটাকে নূতন প্রজন্মের জন্যে সহজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাংলায় অনুবাদ করে দেয়ার? এই কবিতার একটি শব্দকে বদলে অন্য একটি শব্দ দেয়ার ক্ষমতা কী কারো আছে?

কবিতা ছেড়ে এবারে গল্পগুচ্ছের একটা গল্প নেয়া যাক। আমার খুব প্রিয় গল্প 'সম্পত্তি-সম্পূর্ণ', কবিগুরু এধরনের একটা কাহিনী কল্পনা করতে পারেন সেটা দেখেই আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। গল্পটির শুরু এভাবে :

বৃন্দাবন কুণ্ড মহাক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, 'আমি এখনই চলিলাম।'

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, 'বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখ-না।'

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীনকালে ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহার বিহারে তাহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীর রক্ষা সম্পর্কে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

গল্পটির প্রতিটি লাইনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে অসম্ভব রসবোধ ছড়িয়ে আছে সেটি যদি কেউ তার নিজের লেখা না পড়ে সেটি কী অনুভব করতে পারবে? সহজ চলিত ভাষায় কেউ যদি এই গল্পটি পুর্ণলিখন করে তাহলে সেখানে এই গল্পটির মূল কাহিনী ছাড়া আর কতো খানি বেঁচে থাকবে? কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং এই দেশের সকল রবীন্দ্র ভক্তের কাছ থেকে বিনীত অনুমতি নিয়ে আমি গল্পটির এই কয়টি লাইন সহজপ্রাচ্য ভাষায় লেখার চেষ্টা করে দেখি কী হয় ঃ

বৃন্দাবন কুণ্ড খুব রেগে এসে তার বাপকে বলল, 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি।'

বাবা যজ্ঞানাথ কুণ্ড বললেন, 'বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা থেকে তোকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করতে যে টাকা পয়সা খরচ হয়েছে সেটা শোধ করার নাম নেই, কিন্তু তার তেজ দেখ!'

যজ্ঞানাথের বাসায় খাওয়া পরার যে ব্যবস্থা তাতে তার যে খুব টাকা পয়সা খরচ হয়েছে তা নয়। আগের যুগে সাধু সন্ন্যাসীরা খাওয়া কিংবা পোষাকে খুব অল্প খরচ করে জীবন কাটাতেন। যজ্ঞনাথের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হত কাপড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোপড় কিংবা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তারও বুঝি সেরকম খুব উচু আদর্শ রয়েছে। তবে সে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি, খানিকটা আধুনিক সমাজের দোষে আর খানকিটা বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতির যে 'অন্যায়' নিয়মগুলো মেনে চলতে হয় তার কারণে।

কাউকে বলে দিতে হবে না, এই প্রজেক্টটুকু আসলে কাজ করবে না। সহজ ভাষায় ব্যাপারটা হয়তো বুঝিয়ে দেয়া যাবে কিন্তু সেটি তখন আর 'রবীন্দ্রনাথ' থাকবে না। নূতন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে যদি তার লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথটুকুই 'মাইনাস' করে দিতে হয় তাহলে আর লাভ কী?

আমার মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি কার্যকর ব্যাপার হবে নূতন প্রজন্মকে বোঝানো। রবীন্দ্রনাথের চমৎকার কিছু কবিতা, কিছু গল্প এক দুটি প্রবন্ধ একটি উপন্যাস যদি জোর করে হলেও তাদের পড়িয়ে দেয়া যায়, আমার ধারণা তারা তার স্বাদটুকু অনুভব করবে, অন্য দশটি লেখা থেকে পার্থক্যটুকু বুঝতে পারবে। চমৎকার একটা কবিতা মুখস্থ করিয়ে যদি সেটাকে গুণগুণ করে আবৃত্তি করানো শিখিয়ে দেয়া যায় তাহলে সেটারও একটা ভিন্ন আবেদন তারা বুঝতে পারবে, কবিতা শুধু পড়লে সম্পূর্ণ হয় না, কানে শুনতে হয় বলে আমার ধারণা!

অন্যেরা কে কী ভাবছেন আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় নূতন প্রজন্মকে কবি রবীন্দ্রনাথের লেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। অসম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে বড় হওয়াটা আমি একেবারেই মেনে নিতে পারি না!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্মারক প্রকাশনা, ২ নভেম্বর ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের নিয়ে কেন স্বপ্ন দেখব না?

'তরুণ প্রজন্ম' বললেই আমাদের চোখে টি-শার্ট পরা সুদর্শন কিছু তরুণ ও উজ্জ্বল রঙের ফতুয়া পরা হাসিখুশি কিছু তরুণীর চেহারা ভেসে ওঠে। আমাদের দেশে মোবাইল ফোন আসার পর কোম্পানিগুলো পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আর এ বিজ্ঞাপনের কারণেই সম্ভবত তরুণ-তরুণীদের এ ছবি আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি অবশ্য বিজ্ঞাপনের তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে কাছাকাছি বাস করি, তাই মাঝে মধ্যেই আমি ভুলে যাই যে ছবিটি সম্পূর্ণ নয়।

সৌদি আরবে মাত্র কয়েক দিন আগে আটজন বাংলাদেশির শিরচ্ছেদ করা হয়েছে (খোদা যেন আমার ওপর করুণা করেন, জীবনে আর কোনো দিন যেন আমাকে এ শব্দটি লিখতে না হয়), পত্র পত্রিকায় তাঁদের যে বয়স লেখা হয়েছে, তাতে তাঁদের কিন্তু আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝেই ফেলতে হবে। বাংলাদেশের ঠিক কতজন মানুষ প্রবাসে আছেন, এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ৬০ থেকে ৮০ লাখ, এ রকম একটা সংখ্যা শুনে থাকি। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের একটা বড় অংশ আমাদের তরুণ প্রজন্মের অংশ, আমি তাঁদের নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখতে পারি না। আমি জানি, অত্যন্ত অল্প কিছু অর্থের জন্য তারা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যযুগীয় দেশে পরিবার-পরিজন ছাড়া নিঃসঙ্গ এক ধরনের জীবন যাপন করেন। এ দেশের অর্থের সবচেয়ে বড় অংশটুকু তাঁদের শ্রম দিয়ে আসে। কিন্তু এ দুর্ভাগা মানুষগুলোর জন্য এ দেশের সরকারের বিন্দুমাত্র মমতা নেই। সৌদি আরবে আটজন বাংলাদেশির নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের পররাষ্ট্রসচিব ঘোষণা দিয়েছেন, সবকিছু ঠিকভাবে হয়েছে। আমরা আমাদের কমনসেন্স দিয়ে জানি, ভয়ংকর একটি অবিচার হয়েছে, টুকরো টুকরো ঘটনার

www.BanglaBook.org

যেসব ছিটেফোঁটা আমাদের পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সেখান থেকে আমরা কোনোভাবেই হিসাব মেলাতে পারি না। বিদেশের মাটিতে কষ্ট করে বেঁচে থাকা এই বিশাল তরুণ প্রজন্ম নিয়ে আমার ভেতরে কোনো স্বপ্ন নেই, কিন্তু দুঃখ, বেদনা ও ক্ষোভ আছে।

বাংলাদেশের অর্থের জোগান দেওয়ার জন্য প্রবাসী শ্রমিকের পরপরই যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁরা হচ্ছেন আমাদের গার্মেন্টসের মেয়েরা। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাজ শেষ হওয়ার পর দল বেঁধে যখন এই মেয়েরা কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে তাঁদের ঘরে ফিরে যেতে থাকেন, যারা তাঁদের দেখেছে তারা সবাই জানে, এ মেয়েগুলোর প্রায় সবাই কম বয়সের তরুণী। আমাদের দেশের যাঁরা বড়লোক, তাঁদের সবারই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে এবং তাঁরা সবাই আমাদের এ মেয়েগুলোকে শোষণ করে বড়লোক হয়েছেন। শুধু যে শোষণ করছেন, তা-ই নয়, তাঁদের মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করেননি। আমার মনে আছে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা ছিল। মৃত্যুর পর তাঁদের প্রাণহীন দেহগুলো সারি সারি ফেলে রাখার দৃশ্যগুলো খবরের কাগজে ছাপা হতো, সেই দৃশ্যগুলো দেখে আমরা হতবাক হয়ে যেতাম। কিন্তু তার পরের অংশটুকু ছিল আরও অনেক ভয়াবহ। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আড়াই হাজার টাকা করে দিয়েছে। এত অল্প দামে মানুষের প্রাণ কিনে নেওয়ার রেকর্ড পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির এ মেয়েগুলো আমাদের তরুণ প্রজন্ম, কিন্তু তাঁদের নিয়েও আমি কেন জানি কোনো স্বপ্ন দেখতে পারি না।

কিছুদিন আগে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে একটা বই বের হয়েছে। অত্যন্ত চমৎকার একটা বই। বাংলাদেশের মেয়েরা শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি– এ ধরনের নানা বিষয়ে কী ধরনের কাজ করছে, কী অবদান রাখছে, তার ওপর চমৎকার প্রবন্ধ। কিন্তু গার্মেন্টসের মেয়েদের নিয়ে একটি লাইনও লেখা নেই! তাঁদের জীবনটুকু নিশ্চয়ই এ দেশের অন্য নারীদের জীবনের তুলনায় এত তুচ্ছ যে একটি গবেষণা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় তাঁদের কথা উঠে আসার কোনো সুযোগ নেই। যাঁরা দেশের নারীদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরাই যদি তাঁদের হিসাবের মধ্যে না ধরেন, আমি কেমন করে এসব প্রজন্মকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব?

ইদানীং গাড়ি দুর্ঘটনা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। সবাই জানে, এর বড় কারণ ড্রাইভারদের দায়িত্বহীনতা। পরিবহন-শ্রমিকদের নেতা, যিনি ঘটনাক্রমে একজন মন্ত্রী, তিনি অবশ্য তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে দেশে আন্দোলন করে

www.BanglaBook.org

চলেছেন। খুব মোটা দাগে তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা যায় যে তাঁরা গাড়িচাপা দিয়ে পথচারী যাত্রীদের মেরে ফেলার একটা লাইসেন্স চান। এ ব্যাপারে আরেকজন প্রতিমন্ত্রীও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, প্রতিটি মৃত্যু পূর্বনির্ধারিত, তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর সঠিক সময়ে মারা গিয়েছেন। (অর্থাৎ বেপরোয়া ড্রাইভারদের কোনো দোষ নেই, তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে সম্ভবত সঠিক কাজটি করছেন)। সবকিছু মিলিয়ে একটা জটিল অবস্থা এবং যাঁরা আমার পরিচিত, তাঁরা কেউ আমাকে রাস্তায় গাড়িতে করে সিলেট থেকে ঢাকায় যেতে দেন না। তাই ইদানীং আমি ট্রেনে যাতায়াত করি। ট্রেনে যাতায়াত করায় আমি ইদানীং আরো একধরনের তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি। তাদের স্কুল-কলেজে পড়ার কথা, কিন্তু তারা মাথায় কলার ঝাঁকা নিয়ে কলা বিক্রি করে, প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে পপকর্ন বিক্রি করে, বগলে খবরের কাগজ চেপে ধরে খবরের কাগজ বিক্রি করে। তাদের কারো কারো কী অসম্ভব মায়াকাড়া চেহারা! দেখে মনে হয়, পরিপাটি করে সাজিয়ে তাদের কোনো একটা গাড়িতে তুলে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে না! এই তরুণ প্রজন্ম বড় হয়ে কী করবে? একটি কিশোরের কি কলা বিক্রি করে করে বড় হওয়া সম্ভব? সেই কিশোরটি কী স্বপ্ন দেখে? আমি কি তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি?

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছেলেমেয়েরা ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনী করেছিল। আমি আর আমার স্ত্রী সেটা দেখতে গিয়েছিলাম। বড় বড় ছবি দেখতে দেখতে আমার স্ত্রী আমাকে বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জিনিস? আমার স্ত্রী বলল, 'ভাষা আন্দোলনে কত মেয়ে কিন্তু একটি মেয়েও বোরকা পরে নেই, একটি মেয়েও হিজাব পরে নেই।' আমি তাকিয়ে দেখি, তার কথা সত্যি। ষাট বছর আগে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের বোরকা পরতে হতো না, এখন মেয়েদের বোরকা পরতে হয়। ষাট বছর আগে এ দেশের মেয়েরা ধর্মহীন ছিল, এখন মেয়েরা ধর্মভীরু হয়ে গেছে– আমি সেটা বিশ্বাস করি না। যাঁরা জ্ঞানীগুণী গবেষক, তাঁরা প্রকৃত কারণটি খুঁজে বের করবেন। আমি সোজাভাবে বিষয়টি এভাবে দেখি, যে সমাজে পুরুষ আর নারী সমান সমানভাবে পাশাপাশি থেকে কাজ করে, সেই সমাজকে মৌলবাদীদের, ধর্ম ব্যবসায়ীদের খুব ভয়। তাই মেয়েদের ঘরের ভেতর আটকে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই যদি ঘরের ভেতর আটকে রাখা না যায় অন্তত বোরকার ভেতর আটকে রাখা যাক।

www.BanglaBook.org

আমাদের সমাজে মেয়েদের পিছিয়ে নেওয়ার এ পরিকল্পনাটুকু কারা করেছে, তারা কীভাবে কাজ করেছে, গবেষকেরা সেগুলো বের করতে থাকুন। কিন্তু আমরা জানি, এ কাজ করেছে পুরুষেরা। কক্সবাজারের পথে একবার হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটি বলল, 'স্যার, আমি আপনার ছাত্রী।' আমি খুবই অপ্রস্তুত হলাম, নিজের ডিপার্টমেন্টের একটা ছাত্রীকে আমি চিনতে পারছি না। আমি এত বড় গবেট! ছাত্রীটি তখন নিজেই ব্যাখ্যা করল। বলল, 'স্যার, আমি তো ডিপার্টমেন্টে বোরকা পরে যাই, তাই আপনি চিনতে পারছেন না।' আমি তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ক্লাসে যার শুধু এক জোড়া চোখ দেখেছি, তাকে আমি কেমন করে চিনব? কিন্তু গত ৫০ বছরে যে মেয়েদের একটি প্রজন্মকে ঘরের ভেতর আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই প্রজন্মকে নিয়ে আমরা কী স্বপ্ন দেখব?

পাকিস্তান নামক দেশটি লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে। সেই দেশে জঙ্গিদের ভয়াবহ একটা উত্থান হয়েছে। ভয়ংকর ভয়ংকর কাণ্ড করার জন্য তারা যাদের ব্যবহার করে, তাদের বেশির ভাগই কিন্তু তরুণ। আমাদের দেশেও এর চেষ্টা করা হয়েছিল। জোট সরকার তাদের উৎসাহ দিয়ে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার খাল কাটা বন্ধ করেছে। আর আওয়ামী লীগ সরকার খাল বুজিয়ে কুমিরগুলোকে বংশবৃদ্ধি করতে দিচ্ছে না। আমাদের দেশে পাকিস্তানি সর্বনাশ ঘটতে পারেনি, কিন্তু তারপরও আমরা হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাই, হিজবুত তাহ্‌রীর বা তাদের সমমনা সংগঠন ঝটিকা মিছিল করছে, আমি তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের চেহারাগুলো দেখি। সবাই কম বয়সী তরুণ। যেভাবেই হোক, তরুণ প্রজন্মের একটা অংশকে মৌলবাদে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেই তরুণদের সংখ্যা কত? মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জন্য তাদের মমতা নেই, ৩০ লাখ মানুষ হত্যাকারী পাকিস্তানের জন্য এখনো তাদের ভেতর মমতা কেমন করে বেঁচে আছে? যুদ্ধাপরাধীদের জন্য তাদের এত ভালোবাসা কেন? এই তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আমরা কী স্বপ্ন দেখব?

শিক্ষানীতি করার কমিটিতে অন্যদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সেখানে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে মাদ্রাসার লেখাপড়াটাকেও আধুনিক করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা যে বৈষম্যের মধ্যে পড়ে, সেটা দূর হয়ে যাওয়ার কথা। যত উৎসাহ নিয়ে শিক্ষানীতি করা হয়েছে, এত উৎসাহে সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমরা দেখেছি, শিক্ষা খাতে টাকা পয়সাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ভবিষ্যতে কী হবে, আমরা জানি না। যা-ই হোক, ভবিষ্যতে কখনো হয়তো মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা ঠিকভাবে লেখাপড়া

www.BanglaBook.org

করার সুযোগ পাবে, কিন্তু তারপরও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটা কিন্তু এখনো অমীমাংসিতই থেকে গেল। তারা মূলধারায় আসতে চাইছে না। যদি না আসে, তাহলে তারা কওমি মাদ্রাসার লেখাপড়া শেষ করে কী করবে? তারা সমাজকে কী দেবে? দেশকে কী দেবে? আমরা এ মুহূর্তে তাদের নিয়ে কী স্বপ্ন দেখব?

উচ্চশিক্ষা বললেই আমাদের চোখে দেশের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছবি ভেসে ওঠে। আমরা ভুলে যাই যে আসলে এ দেশে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি, তার নাম 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা কি জানি, বড় বড় হাইফাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাদের চাকচিক্য নিয়ে সাঁই সাঁই করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী (হ্যাঁ, হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ) ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কী চরম অবহেলায়, শিক্ষক ছাড়া, ক্লাসরুম ছাড়া, কোনো ধরনের মমতা ছাড়া আমরা কত লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনটুকু নষ্ট করে দিচ্ছি! আমরা আমাদের এ তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কী স্বপ্ন দেখব, কেউ কি বলে দেবে?

আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন অসম্ভব সৌভাগ্যবান মানুষ। আমি যে কাজগুলো করতে সবচেয়ে ভালোবাসি, সারাটি জীবন সে কাজগুলোই করার সুযোগ পেয়েছি। আমার চমৎকার সব সহকর্মী, তরুণ প্রজন্মের বিশাল একটা অংশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। তাদের নিয়ে আমরা গণিত অলিম্পিয়াড করি, ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড করি, সায়েন্স অলিম্পিয়াড করি (দাবা অলিম্পিয়াড প্রথমাবারের মতো শুধু করার একটা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করা হয়েছে), মোবাইল টেলিফোনে ভর্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ফেলা নতুন নতুন কাজ করার স্বপ্ন দেখি। সবকিছু করার পরও আমার বুকের ভেতর কোথায় যেন টনটন করতে থাকে। দেশের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান তরুণ প্রজন্মের একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আমাদের সবার স্বপ্ন, আমাদের উচ্ছ্বাস, আমাদের গর্ব আর অহংকার।

অন্যরা কী দোষ করেছে? তাদের নিয়ে আমরা কোনো দিন স্বপ্ন দেখব না, এটা কেন এত সহজে আমরা মেনে নিলাম?

প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজয় দিবসের চল্লিশ বছর

চল্লিশ বছর দীর্ঘ সময়। চল্লিশ বছর আগে আমার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার বেশির ভাগ স্মৃতিই আমার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই বিজয় দিবসের প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে, মনে হয় মাত্র সেদিনের ঘটনা। মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় আমাদের প্রজন্ম একই সাথে এই পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য এবং সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রজন্ম। আমরা হতভাগ্য কারণ মানুষ কতো নৃশংস হতে পারে। কতো অবিশ্বাস্য নির্লিপ্ততায় আরেকজনকে হত্যা করতে পারে, কতো সহজে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিদেশী প্রভুর পদ লেহন করতে পারে নিজের চোখে দেখতে হয়েছিল। আবার আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রজন্ম কারণ ভয়ংকর দুঃসময়ে মানুষ কীভাবে একজন আরেক জনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বুক আগলে রক্ষা করে, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে কীভাবে অকাতরে নিজের প্রাণ দিতে পারে সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলোও আমাদের হৃদয় দিয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, নয় মাসের অবিশ্বাস্য সেই পাকিস্তানী বিভীষিকার পর একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর যখন উচ্চকণ্ঠে 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি প্রথমবার উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম সেই মুহূর্তটুকুর তীব্র আনন্দ এই দেশের অন্য কোনো প্রজন্ম অন্য কোনো কালে অনুভব করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সদ্য মুক্ত হওয়া সেই দেশটি কোনো বিমূর্ত বিষয় ছিল না, আমাদের কাছে সেই দেশটি ছিল ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বুক আগলে রক্ষা করা যায়, ভালোবাসা যায় সেরকম একটি শিশুর মতো, যাকে আমরা হিংস্র একটা পশুর, মুখ থেকে রক্ষা করে এনেছি। নিজের দেশের জন্যে সেই তীব্র গভীর ভালোবাসা যারা অনুভব করতে পারে তাদের থেকে বেশি সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

www.BanglaBook.org

তারপর কতোদিন পার হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, সেনা শাসক এসেছে, রাজাকারেরা গর্ত থেকে বের হয়েছে। দেশ অন্ধকারে ডুবে গেছে, সেই অন্ধকারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, একাত্তরে এই দেশে 'গণ্ডগোল' হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ আসলে বড় কিছু নয়। যুদ্ধ হয়েছিল হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে। জাতীয় পতাকা এক টুকরা কাপড়, দেশ বলে কিছু নেই, ক্রিকেট খেলোয়াড় দিয়ে দেশের পরিচয়, মুখে পাকিস্তানের পতাকা আঁকা যায়, জাতীয় সঙ্গীত না জানলে ক্ষতি নেই, মেয়েদের বোরকা পরে থাকাই ভালো। অতীতকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করা ঠিক না, রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা ভাই ভাই আরো কতো কী! সেই কালো অন্ধকার সময়ে জন্ম নেয়া প্রজন্মের পর প্রজন্মের নির্লিপ্ত বোধশক্তিহীন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খুব সৌভাগ্য তার মাঝেও দেশের জন্যে গভীর মমতা নিয়ে নূতন তরুণ প্রজন্মের জন্ম হয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখি তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশকে গ্লানিমুক্ত করার আন্দোলনে এখন তারা সবচেয়ে বড় শক্তি।

যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে আলাপ আলোচনার শেষ নেই। যে কথাটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয় 'আন্তর্জাতিক মানের বিচার' আমি সেই কথাটিই বুঝতে পারিনা। বিচারের কী দেশীয় মান এবং আন্তর্জাতিক মান বলে কিছু আছে? পৃথিবীর অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই অনেক দেশে চুরি করলে হাত কেটে ফেলে তার কোনটি আন্তর্জাতিক? দেশীয় মান কী আন্তর্জাতিক মান থেকে আলাদা? আমাদের দেশে এতোদিন যে বিচার হয়েছে সেগুলো কি সব ভুল নাকি আন্তর্জাতিক কোনো মাতব্বরদের এনে তাদের সার্টিফিকেট নিতে হবে? সবচেয়ে বড় কথা এই আন্তর্জাতিকমানের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যে মোড়ল মাতব্বরেরা কোন দেশে থাকেন? সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতাটা তাদের কে দিল?

বি.এন.পি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা দিয়েছিল যে যুদ্ধাপরাধীদের এই বিচার তারা মানে না। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে যে কোনো দল বা কোনো মানুষ আর টিকে থাকতে পারবে না। বি.এন.পি এই সহজসত্যটা এখনো জানে না দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। বি.এন.পি খানিকটা টের পেয়েছে, দ্রুত তাদের কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলছে যুদ্ধাপরাধীর বিচার তারা মানে কিন্তু সেটি হতে হবে আন্তর্জাতিকমানের! এই দেশের আর কোন কোন দেশী বিষয় আন্তর্জাতিকমানের হওয়া উচিৎ আমি সেটা জানতে খুব কৌতুহলী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আন্তর্জাতিক মানের বিচারের কথা শুনে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে সেক্টর কমান্ডারদের একটি মানব বন্ধনে আমি গিয়েছি সেখানে একজন হঠাৎ আমাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসলেন। তিনি উত্তেজিত গলায় আমাকে জিজ্ঞেস কররেন, "এই রাজাকারের দল একাত্তরে যখন আমার বাবাকে মেরেছিল তখন কী তারা আন্তর্জাতিক আইনে তাকে মেরেছিল? তাহলে এখন কেন তাকে আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করতে হবে?'

আমি তার প্রশ্নের উত্তরে কিছু একটা বলতে পারতাম কিন্তু তার অশ্রুরুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারি নি। এই মানুষটির মতো এই দেশের অসংখ্য মানুষের বুকে ধিকি ধিকি করে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। যুদ্ধাপরাধীর বিষয় শেষ করে কখন আমরা তাদের বুকে একটু খানি শান্তি দিতে পারব?

দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নূতন প্রজন্ম ও বিজয় দিবস

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের শুধু স্বাধীনতা দিবস থাকে– আমাদের দুটো দিবস। একটা হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস আকেরটা বিজয় দিবস। আমার সব সময়েই মনে হয়েছে এটা ভারী চমৎকার একটা ব্যাপার। পৃথিবীর অন্য সব দেশ যে চাইলেই একটা বিজয় দিবস করে ফেলতে পারবে তা নয়! বিজয় দিবস পালন করতে হলে একটা বিজয়ের দরকার, যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে এরকম দেশ পৃথিবীতে আর কয়টা আছে? পাকিস্তান আর ভারত স্বাধীন হয়েছে কাগজ পত্রে সাইন করে– পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই এরকম। এই রকম স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষের কাছে রীতিমত পানশে মনে হওয়ার কথা! আমাদের স্বাধীনতার পুরো ইতিহাসটা কী অসাধারণ– চল্লিশ বছর পরেও দেশের মানুষ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় আমাদের প্রজন্ম কী অসাধারণ সৌভাগ্যবান, আমরা সেই ষাটের দশক থেকে এই দেশটাকে দেখে এসেছি, একটা আস্ত দেশ কীভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে গর্জন করে উঠে সেটা কি নূতন প্রজন্ম কখনো দেখতে পাবে? তারা অবশ্যি অসংখ্য হরতাল দেখেছে, কিন্তু এই হরতালগুলো হচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। সত্যিকারের হরতাল কীভাবে পালন করা হয়, পুরো দেশ কীভাবে মুহূর্তের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে অচল হয়ে যায় তারা কি কখনো কল্পনা করতে পারবে? শুধু তাই নয়, একটা নগরী কীভাবে মিছিলের নগরী হয়ে যায় সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য শুধু নূতন প্রজন্ম কেন, পৃথিবীর কোন দেশের কোন প্রজন্ম দেখেছে বলে দাবী করতে পারবে?

যখন বিজয় দিবস আসে তখন আমার প্রজন্মের সবার মনে সেই দিনগুলোর স্মৃতি এসে ভিড় করে। একাত্তুরের সেই নয় মাসের সেই সময়টুকু ছিল একটা অবিশ্বাস্য সময়। একই সাথে সেটি আপনজন হারানোর গভীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেদানার সময়, নৃশংস অত্যাচার দেখে ভয়ংকর ক্রোধে ফেটে পড়ার সময়, মানবতার চরম অবমাননা দেখে গভীর হতাশায় ডুবে যাবার সময়, আবার দেশের জন্যে গভীর মমতায় অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দেবার সময়। আমাদের প্রজন্ম– যারা সেই অবিশ্বাসী সময়ের ভেতর দিয়ে এসে নিজের চোখে ষোলই ডিসেম্বরের বিজয় দেখেছে, তাদের মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছে? আনন্দ কতো তীব্র হতে পারে সেটি কি নূতন প্রজন্ম কোনোদিন অনুভব করতে পারবে?

স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বার পার হবার পর আমাদের একই সাথে সম্পূর্ণ নূতন একটা উপলব্ধি হয়েছে। পৃথিবীর নৃশংসতম প্রাণী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর তাদের আজ্ঞাবহ অনুচর রাজাকার আলবদরদের পরাজিত করতে সময় লেগেছিল মাত্র নয় মাস। কিন্তু যে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমরা নয় মাসে দেশটি স্বাধীন করেছিলাম, সেই বাংলাদেশ তো আমার এখনো গড়তে পারি নি। দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর হতে চললো, এখনো তো আমরা জোর গলায় বলতে পারি না যে আমরা আমাদের দেশটি পেয়েছি। আমাদের কী এখন মনে হয় না, স্বাধীনতা অর্জনটুকুই বুঝি সহজ ছিল– মাত্র নয় মাসে সেটা পেয়েছি। স্বপ্নের দেশে পরিবর্তন করাই বুঝি কঠিন– চল্লিশ বছরেও সেটা সোনার হরিণ হয়ে আমাদের স্পর্শের বাইরে থেকে গেল।

নূতন প্রজন্ম মাঝে মাঝে দুঃখ করে আমাকে বলে, 'ইশ! আপনারা কী সৌভাগ্যবান– আপনাদের প্রজন্মের মানুষেরা দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে পেরেছে!'

তাদের কথা একশ ভাগ সত্যি। কিন্তু স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর আমরাও তাদেরকে বলতে পারি, 'তোমরাও কম সৌভাগ্যবান নও। স্বাধীনতা অর্জনের মতই কঠিন একটা কাজের সুযোগ তোমরা পেয়েছ। সেটা হচ্ছে দেশটাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়া করানো! সেই সুযোগটাই আর কয়জন পায়?'

আজ বিজয়ের দিনে আমরা নূতন প্রজন্মকে আমরা সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিই!

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলেজিয়েট স্কুলের স্মৃতি

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ছিল আমার বড় হওয়ার প্রথম ধাপ– প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুলে আসা। কলেজিয়েট স্কুলে এসে অবশ্যি একটা ধাক্কা খেলাম, ক্লাস সিক্স মানে সবচেয়ে ছোট ক্লাস উচ্চ ক্লাসের ছেলেরা আমাদের কোনো গুরুত্বই দেয় না! আমরা অবশ্যি সেটি নিয়ে মাথা ঘামালাম না, নিজেরা নিজেরা মহা আনন্দে সময় কাটাতে শুরু করলাম। ক্লাস যতক্ষণ চলতে থাকে ততক্ষণ উশখুশ উশখুশ করতে থাকি কখন টিফিনের ছুটি হবে কখন এক ছুটে মাঠে বের হয়ে যাব।

কিছুদিনের মাঝেই অবশ্যি একটা সমস্যা দেখা দিল, নূতন একজন স্যার এসেছেন ক্লাসে অনেক ভালো ভালো কথা বলেন এবং স্কুলের টিফিনের ছুটিতে মাঠে দৌড়াদৌড়ি না করে নামাজ পড়ার হুকুম দিলেন। দশ এগারো বৎসরের বাচ্চাদের সে রকম ধর্ম ভাব থাকার কথা না, আমাদেরও ছিল না। পরকালে সৃষ্টিকর্তার শাস্তি অনেকেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইহকালে নামাজ না পড়ার জন্যে স্যারের পিটুনি রীতিমত অসহ্য হয়ে উঠল। আমরা ক্লাস সিক্সের বাচ্চা কাচ্চা হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে চলে আসতাম এখন নামাজ পড়ার জন্যে বাসা থেকে ঢলঢলে একটা পায়জামা পরে আসতে হয়, টিফিনের ছুটিতে দৌড়াদৌড়ি করে খেলাও ঝামেলা হয়ে গেল! শেষে বুদ্ধি করে আমার বাবার একটা লুঙ্গি খুলের ব্যাগে করে ক্লাসে আনতে শুরু করলাম। হাফ প্যান্টের উপর সেটা পরে নামাজ পড়তে যেতাম– নামাজ পড়ার পর লুঙ্গি খুলে ব্যাগে রেখে ছোটাছুটি শুরু করতাম।

একদিন ক্লাশে বসে আছি হঠাৎ করে আমাদের সেই স্যার ক্লাসে হাজির, এসে কথা নেই বার্তা নেই ধড়াম করে আমাকে মেরে বসলেন, আমি একেবারে চমকে উঠলাম, হঠাৎ করে এই আক্রমণ কেন? স্যার হুংকার দিয়ে বললেন,

www.BanglaBook.org

'ক্লাসে হাফ প্যান্ট পরে এসেছিস? তাহলে নামাজ পরবি কেমন করে?'

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম. 'নামাজ পড়ার জন্যে লুঙ্গী এনেছি?' এইবার স্যারের অবাক হওয়ার পালা, 'লুঙ্গি এনেছিস? কোথায় লুঙ্গি?'

আমি ব্যাগ খুলে স্যারকে লুঙ্গি দেখালাম এবং তখন তার ভেতর আবেগ সুনামির মতো ছড়িয়ে পড়ল! ক্লাসের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলে হচ্ছে সত্যিকারের আদর্শ ছেলে! নামাজ পরার জন্যে যে ব্যাগে করে লুঙ্গি নিয়ে এসেছে।'

আমার সম্পর্কে কথা বলতে বলতে তার চোখ থেকে প্রায় ঝরঝর করে পানি ঝরার অবস্থা। আমি তখন খুব ছোট তারপরেও পুরো ব্যাপারটার মাঝে যে ফাঁকটুকু রয়েছে সেটা আমি ঠিকই ধরতে পেরেছিলাম– আমি সত্যিকারের আদর্শ ছেলে হিসেবে ব্যাগের ভেতরে লুঙ্গি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম না, স্যারের উৎপাতে ঘুরে বেড়াতাম। এতোদিন পরেও আমি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে একটু বিরক্ত অনুভব করি। স্কুলের শিক্ষকরা কেন ছোট বাচ্চাদের ছোট বাচ্চা হয়ে থাকতে দেন না?

ক্লাশে মারপিটের কথাই যখন শুরু হয়েছে মনে হয় আরেকটু বলা দরকার। এখনো খবরের কাগজে আমরা দেখতে পাই কোথাও কোথাও ক্লাশের স্যারেরা স্কুলে ছেলে মেয়েদের গায়ে হাত তুলছেন। দেশে আইন পাশ হয়েছে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তুলতে রীতিমত তাদের শাস্তি পেতে হবে তারপরেও তারা থামছেন না। শুধু স্কুলে নয় কলেজেও শিক্ষাকরা মারধোর করেন, কোনো একটা কলেজের ছাত্র গোপনে ভিডিও করে আমার কাছে পাঠিয়েছিল যেখানে শিক্ষক একটা ছাত্রীকে পেটাচ্ছেন– আমি সেটা একটা টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানোর ব্যবস্থাও করেছিলাম, খুব একটা লাভ হয়েছে মনে হয় না এখনো যখন এই অবস্থা তখন প্রায় অর্ধশত বৎসর আগে স্কুলগুলোর অবস্থা কী ছিল কল্পনা করা কঠিন নয়। অনেক শিক্ষকই ছিলেন যাদের রীতিমত মানসিক বিকৃতি ছিল। সেরকম একজন স্যারকে ডান্ডি বলে ডাকতো, কেন তার এই নামকরণ হয়েছিল আমার জানা নেই। এই স্যার ক্লাশে এসে কোনোদিন কিছু পড়াতেন না, শুধু আমাকে আর আরেকজনকে প্রশ্ন করে যেতেন। সব প্রশ্ন যে লেখাপড়ার তা নয় কিন্তু কেন আমাদের দুইজনকে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমি চল্লিশ বছর পরেও বুঝতে পারি না। এই মানুষটি আমাদের দুইজনকে কোনোদিন মারেন নি কিন্তু অন্যদের এতো নির্দয় ভাবে শাস্তি দিতেন যে চিন্তা করে এতোদিন পরেও আমি শিউরে উঠি। একটা উদাহরণ দিলে

www.BanglaBook.org

খানিকটা অনুমান করা যাবে, যাকে শাস্তি দিতে চাইছেন তার মাথায় একটা ব্লাকবোর্ড রেখে তার উপর অন্য একটা ছাত্রকে বসিয়ে দিতেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছেলেটি থরথর করে কাঁপতে থাকতো এবং সেই দৃশ্যটি দেখে তিনি আনন্দে হাসতে থাকতেন! আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই নিষ্ঠুর মানসিক রোগীকে খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞেস করি, এতো ছোট ছোট বাচ্চাদের এরকম ভয়ংকর শারীরিক শাস্তি দিয়ে তিনি কোন আনন্দটুকু পেতেন?

ক্লাশের ভেতর এরকম নিরানন্দ পরিবেশ থাকলেও ক্লাশের বাইরে গেলেই আমাদের জীবন হাসি এবং আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতো। তখন স্কুলে টিফিন দেয়া হতো হঠাৎ করে শুনতে পেলাম টিফিনের জগতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসছে। বিদেশ থেকে কোনো একটা বিশেষ ধরনের গম পাঠানো হয়েছে এবং সেটা দিয়ে বিশেষ খিচুড়ি তৈরি করে আমাদের খাওয়ানো হবে। দেখতে দেখতে বিশাল যজ্ঞ দজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। সেই খিচুড়ি রান্না হল এবং ক্লাশে ক্লাশে সেটা নিয়ে আসার জন্যে আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে গেলাম। লেখাপড়া বন্ধ, আমরা খিচুড়ি আনি এবং বিতরণ করি। খ্যাটের মত সেই জিনিসটার নাম 'বুলগার হুইট' এবং তার একটুখানি মুখে দিতেই আমার পুরো নাড়ী ভূড়ি উল্টে এলো! কিছুদিন এই এক্সপেরিমেন্ট চলল, তারপর যেরকম হঠাৎ করে এটি উদয় হয়েছিল ঠিক সেভাবে এটা বিদায় হয়ে গেলো। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কলেজিয়েট স্কুলের আনন্দের স্মৃতি হচ্ছে জীবনের প্রথম অর্থ উপার্জনের স্মৃতি। ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলাম সেই বৃত্তির টাকা দেয়া হবে। যেদিন টাকাটা দেয়া হবে উত্তেজনায় আমাদের ঘুম নেই। সবাই নানা আকারের ব্যাগ মানিব্যাগ নিয়ে এসেছি। সেই ব্যাগ মানিব্যাগ একজন আরেকজনকে দেখাচ্ছি এবং অপেক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের ডাক পড়ল এবং আমাদের হাতে সেই টাকা তুলে দেয়া হল। উত্তেজনায় আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার অবস্থা– চকচকে নোট মানিব্যাগ ভরে বাসায় এসেছি– গর্বে আমার বুক প্রায় একশো হাত ফুলে উঠেছে! তখন ছোট টাকা উপার্জন করেছি কিন্তু খরচ করার অধিকার নেই! মায়ের হাতে তুলে দিয়েই আনন্দ।

কলেজিয়েট স্কুলে থাকাকালীন সময়ে আমি প্রথম স্কাউটে যোগ দিয়েছিলাম আমরা অবশ্য পুরোপুরি স্কাউট নই, কাব বলে ডাকে। কাবের পোষাক পরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। নানারকম কম্পিটিশান হয় খুব উৎসাহ নিয়ে সেগুলোতে যোগ দিই। হাতের কাজের একটা প্রতিযোগিতা হতো সেটাতে

www.BanglaBook.org

আমাদের হারানো কঠিন ছিল, আমি চোখের পলকে অনেক কিছু বানিয়ে ফেলতে পারতাম। একবার এরকম একটা প্রতিযোগিতায় গিয়েছি নানা কিছু হচ্ছে আমরা ছোটাছুটি করছি। মাঠের চারিদিকে অসংখ্য দর্শক আগ্রহ নিয়ে দেখছে। প্রতিযোগিতার একটা অংশে দুটো টেবিলের উপর একটা বাঁশ রাখা হয়েছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সবাই চলে গেছে এখন আমার পালা। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটিতে আমার কখনো কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু সেদিন কী হল কে জানে বাঁশে পা রাখতেই পিছলে ধড়াম করে নিচে পড়ে গেলাম। পড়ে ব্যথা পেয়েছি কী না সেটা টের পাবার আগেই শুনতে পেলাম চারপাশের হাজার হাজার দর্শক আনন্দে হা হা করে হাসছে।

সেই প্রথম আমি অসংখ্য মানুষকে আনন্দ দিয়েছিলাম এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিপাইমুখ : একটি প্রতিক্রিয়া

১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের গভর্নর পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ক্লেটন উইলিয়ামস নামে এক ব্যক্তি। ভদ্রলোক নির্বাচনে জিততে পারেননি, কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে তাঁর একটি উক্তির জন্য। তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণ থেকে যদি রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে চেষ্টা করা উচিত সেটা উপভোগ করা। (আমি যা-ই লিখি, ছোট বাচ্চারা নাকি সেটা পড়ে ফেলে– তাই ওপরের কথাগুলো লিখতে খুব খারাপ লাগছে।) ক্লেটন উইলিয়মসের কথার মতো হুবহু একটা কথা ২৯ ডিসেম্বর ২০১১-এর প্রথম আলোয় পড়েছি। টিপাইমুখ সম্পর্কে মহিউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, 'ভারত এই বাঁধ তৈরি করবেই, আমাদের কৌশল হওয়া উচিত এ থেকে আমরা কী সুবিধা নিতে পারব সেই চেষ্টা করা।'

এর কিছুদিন আগে গওহর রিজভী পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলেন। সেই লেখাটিতে নানা রকম ভণিতা ছিল, দেশ, দেশের স্বার্থ– এই সব বড় বড় কথা ছিল এবং পুরো লেখাটিতে পাঠকদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন আবেগের বশবর্তী হয়ে হঠকারী কাজকর্ম শুরু করে না দেয়। গওহর রিজভী সরকারের মানুষ, তাঁর লেখাটি পড়ে আমরা সবাই সরকারের ভূমিকাটা কী হবে, তা আঁচ করতে পেরেছিলাম।

আমি নদী বিশেষজ্ঞ নই, পানি বিশেষজ্ঞ নই, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমার গত ৫৯ বছরের অভিজ্ঞতায় একটা জিনিস শিখেছি, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর জটিল থেকে জটিলতম বিষয়টিও কমন সেন্স দিয়ে প্রায় ৯০ ভাগ বুঝে ফেলা যায়। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ টিপাইমুখের বিষয়টি শতকরা ৯০ ভাগ শুধু কমন সেন্স দিয়ে কিন্তু বুঝে ফেলেছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞ কিউসেকের হিসাব, বর্ষা মৌসুম, শুষ্ক মৌসুম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে থাকুন,

www.BanglaBook.org

আমরা সাধারণ মানুষ কিছু সাধারণ প্রশ্ন করি :

আমরা কি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করব, নাকি প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করব? একেবারে ছোট শিশুটিও জানে পৃথিবীতে প্রযুক্তি এখনো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায় পৌঁছায়নি, কোনো ভূমিকম্প থামানো যায় না, কোনো ঘূর্ণিঝড় বন্ধ করা যায় না, পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ঢল আটকানো যায় না। ঠিক সে রকম একটা নদীকে বন্ধ করা যায় না, গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। নির্বোধ মানুষ যে চেষ্টা করে না তা নয়, পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই করা হয়েছে; কিন্তু সেটা মানুষের ওপর অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। ভবদহের কথা আমরা ভুলিনি, ফারাক্কা আমাদের চোখের সামনেই আছে। কাজেই গওহর রিজভী কিংবা মহিউদ্দিন আহমেদের মতো বিশেষজ্ঞরা যতই বলুন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাঁধ তৈরি করে' বাংলাদেশকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা করে ফেলতে হবে আমি সেই কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের দেশে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বিশাল এলাকা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অসংখ্য অসহায় আদিবাসী মানুষকে রাতারাতি গৃহহারা করা হয়েছিল। এখন সেই চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন সেটা হতে দিত না, কোনো সরকারের সেই দুঃসাহস দেখানোর সাহস হতো না।

কাজেই বিশেষজ্ঞরা যতই বলতে থাকুন টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ, আমি সেটা বিশ্বাস করি না। যারা প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আসলে তারা পৃথিবীর ভালো চায় না। তারা বাংলাদেশের মানুষ হোক, ভারত বা চীন যে দেশেরই হোক, তাদের ধিক্কার দিতে হবে। তারা হচ্ছে পৃথিবীর দুর্বৃত্ত।

গওহর রিজভী এবং মহিউদ্দিন আহমেদ দুজনই টিপাইমুখ বাঁধের সুফল নিয়ে ভালো ভালো কথা বলেছেন, তার বেশির ভাগ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা তর্ক-বিতর্ক করতে থাকুন। আমি শুধু একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে বন্যা। তাঁরা দুজনেই দাবি করেছেন এই বাঁধ দিয়ে বন্যার প্রকোপ কমানো যাবে। আমি সিলেটে থাকি, আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুরমা নদীর দূরত্ব এক কিলোমিটারও নয়। আমি এখানে ১৭ বছর ধরে আছি, শুধু একবার (২০০৪ সালে) সুরমা নদীর পানি উপচে এসেছিল, আমি তো আর কখনো সুরমা নদীর পানিকে তীর ভেঙে আসতে দেখিনি! হাওর অঞ্চল তো প্রতিবছর পানিতে ডুবে যায়, ডুবে যাওয়ারই কথা, সেটাই হচ্ছে এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র। সেটা তো বন্যা নয়। তাহলে তাঁরা কোন বন্যাকে ঠেকানোর কথা বলছেন? যে বন্যার অস্তিত্ব নেই, সেই বন্যার প্রকোপ থামানোর কথা বললে আমরা যদি বিশেষজ্ঞদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাই কেউ আমাকে দোষ দিতে পারবে? এই বন্যা নিয়ে তাঁদের বিশেষজ্ঞ মতামত আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়– ঠিক সে রকম তাঁদের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ

www.BanglaBook.org

মতামতও যে অর্থহীন নয়, সেই গ্যারান্টি আমাকে কে দেবে?

মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'ভারত এই বাঁধ তৈরি করবেই', তিনি তার বিরোধিতা করতেও রাজি নন। কোনো রকম চেষ্টা না করে পরাজয় স্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। টিপাইমুখ বাঁধ বন্ধ করার চেষ্টাকে এ মুহূর্তে তাঁর কাছে এবং সম্ভবত আরও অনেকের কাছে খুব কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। সারা দেশে টিপাইমুখের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা এই মানুষগুলোর কাছে একটা অযৌক্তিক এবং অসম্ভব কাজ বলে মনে হচ্ছে। কাজেই তাঁরা এর জন্য চেষ্টা করতেও রাজি নন।

তাঁদের সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া যায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন এই দেশে গণহত্যা শুরু করেছিল তখন কোনো মানুষ যদি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিবেচনা করত তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই ধরে নিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা একটা পুরোপুরি অবাস্তব বিষয়। মার্চ মাসে শুরু করে মে মাসের মাঝা মাঝি পুরো দেশটা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছিল। এখন যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করা হচ্ছে তারা সেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদলেহী অনুচর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মতো দেশ পাকিস্তানের পক্ষে, পৃথিবীর মুসলমান দেশগুলোও পাকিস্তানের পক্ষে, এক কোটি মানুষ দেশছাড়া, যারা দেশে আছে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে, খুন করে সারা দেশে হাহাকার। দেশের কিছু কম বয়সী ছেলেমেয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়েছে, তাদের হাতে অস্ত্র নেই, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই, পেশাদার বাহিনী বিশৃঙ্খল, যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের মধ্যেও কোন্দল–এ রকম একটা পরিবেশ দিয়ে শুরু করে আমরা স্বাধীন একটা দেশ ছিনিয়ে আনতে পারব সেটা কি কেউ কল্পনা করেছিল? করেনি। কিন্তু তার পরও এই দেশের মানুষ দেশপ্রেমের যুক্তিহীন আবেগকে মূলধন করে এই দেশকে স্বাধীন করে ছেড়েছিল।

কাজেই যাঁরা এই দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা তাঁরা এই দেশের মানুষের 'যুক্তিহীন' আবেগকে খাটো করে দেখবেন না। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না, তার সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়। টিপাইমুখের বেলায়ও হুবহু একই কথা বলা যায়– দেশের মানুষের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার বৃথা চেষ্টা করবেন না, তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করুন।

দৈনিক প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি ২০১২

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নূতন বাংলাদেশ

রক্তদান কর্মসূচি অত্যন্ত মহৎ একটা কর্মসূচি, কিন্তু আমি বহুদিন কোথাও রক্ত দিই নি। আমার ধমনীতে সূচ ফুটিয়ে কেউ শরীর থেকে রক্ত বের করে নিচ্ছে বিষয়টা চিন্তা করেই আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠত! একবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে, তখন ছাত্রছাত্রীরা এসে আমাকে ধরেছে রক্ত দেবার জন্যে– আমি রক্ত দিলে আমাকে দেখে নাকি অনেকেই রক্ত দেবে। বিষয়টাকে যে আমি খুব ভয় পাই সেটা মুখ ফুটে বলতেই পারলাম না– আমাকে একটা বেডে শুইয়ে হাতের একটা ধমনীতে পুট করে একটা সূচ ফুটিয়ে তারা আমার রক্ত নিতে শুরু করল। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম রক্ত দেওয়ার পুরো ব্যাপারটা যন্ত্রণাহীন এবং সহজ। মনে মনে ভয় ছিল যে আমি যখন ওঠে দাঁড়াব তখন হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমার কিছুই হলো না, মেডিকেলের স্বেচ্ছাসেবী ছাত্রছাত্রীরা আমাকে একটা কোল্ড ড্রিংক খাইয়ে দিলো, সেটা খাবার কারণেই নাকি রক্ত নেবার কারণে শূন্যতার আশি ভাগ পূরণ হয়ে গেছে। কিছুদিন পর মেডিকেলের সেই ছাত্রছাত্রীদের সাথে দেখা হয়েছে, তারা আমাকে বলল, 'স্যার আপনার রক্তের প্যাকেটটা আমরা টাঙ্গাইল পাঠিয়েছিলাম।' তারা সবার রক্তের প্যাকেটের খবর রাখে কী না জানি না, কিন্তু আমারটা রেখেছিল।

এরপর একটা খুব মজার ব্যাপার ঘটলো, কিছুদিন পর আমি টাঙ্গাইল গিয়েছি। শহরে পৌঁছানোর পরেই আমার হঠাৎ করে মনে হলো এই শহরের কোনো একজন মানুষের শরীরে আমার রক্তটুকু দেয়া হয়েছে– সাথে সাথে একটা বিচিত্র আনন্দে আমার বুকটা ভরে উঠলো। আমি যার দিকেই তাকাই তাকে দেখেই মনে হয় হয়তো এই মানুষটার শরীরে আমার রক্ত আছে!

বিষয়টা অত্যন্ত ছেলেমানুষী কিন্তু এই ছেলেমানুষী কাজটুকু দিয়ে আমি

www.BanglaBook.org

নূতন করে অনেক আগেই শেখা একটা জিনিস আবার নূতন করে আবিষ্কার করলাম। নিজের জন্যে হাতি ঘোড়া করে ফেললেও সেটা মনে কোনো দাগ কাটে না কিন্তু অন্যের জন্যে ছোট থেকেও ছোট কোনো কাজ করলে সেই আনন্দে মনটা একেবারে টই-টম্বুর হয়ে থাকে। আমার মনে হয় এটা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে আদি অকৃত্রিম এবং খাঁটি অনুভূতি। আমার ধারনা পৃথিবীটা টিকে আছে এই একটা কারণে– অন্যের জন্যে ভালবাসায়। এটা না থাকলে মনে হয় এই পৃথবীটা আর পৃথিবী থাকতো না অন্য কিছু হয়ে যেতো।

আমি জানি না সবাই লক্ষ্য করেছে কী না– সারা পৃথিবীতেই কিন্তু মানুষের সবচেয়ে আদি অকৃত্রিম এবং এই খাঁটি অনুভূতিটাকে খাঁটো করে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটা নূতন পৃথিবী তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেখানে সবাইকে বোঝানো হচ্ছে তোমার জীবনটা অন্যের জন্যে নয়। তোমার জীবনটা আসলে তোমার জন্যেই– তুমি নিজের জন্যে যেটুকু পারো সেটুকু অর্জন করে নাও। আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে খুব যত্ন করে এরকম একটা প্রজন্ম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা বিজ্ঞ মানুষ তারা হয়তো এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে পারবেন, আমি আমার স্বল্প বুদ্ধিতে অনুমান করতে পারি এর মাঝে বেচা কেনার ব্যাপার আছে। যারা জিনিস বেচাকেনা করে তারা চায় সবাই যেন ভোগ করতে শেখে, একজন যত বেশি ভোগ করবে তারা ততো বেশি জিনিস বেচা কেনা করতে পারবে। আমরা যারা ষাট এবং সত্তুরের দশকের ভেতর পা ফেলে এসেছিল তাদের কাছে এই পুরো ব্যাপারটাকে কেমন জানি অশালীন মনে হয়।

আগের প্রজন্ম সব সময়েই পরের প্রজন্মকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশায় মাথা নাড়ে, আমি কিন্তু মোটেই সেটা করি না। আমার কাছে খুব ভাল লাগে যখন আমি দেখি শত ঝামেলার পরেও আমাদের দেশে খুব চৌকস একটা নুতন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। আমার মনে আছে সিপিডি আয়োজিত 'ইয়ং প্রফেশনালদের' একটা অনুষ্ঠানে আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেশ সম্পর্কে তারা কী ভাবে সেটা আমি একেবারে সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। তারা যে বিষয়গুলো বলেছিলেন সেটা ছিলো যেমন চমৎকার তারা যেভাবে বলেছিলেন সেটা ছিলো তার থেকেও চমৎকার। আমার ধারণা এই নূতন প্রজন্ম ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই তারা পুরানো মানুষদের জায়গা ধীরে ধীরে দখল করে নিতে যাচ্ছেন।

www.BanglaBook.org

এই নূতন প্রজন্ম আমাদের পুরাতন প্রজন্ম সম্পর্কে কী ভাবে সেটা জানার জন্যে মাঝে মাঝে আমার এক ধরনের কৌতহল হয়। পুরাতন প্রজন্মটি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এটি নিশ্চয়ই তারা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। কিন্তু সবাই যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলো সেই বাংলাদেশটি যে এখনো পায়নি সে জন্যে তারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রজন্মকেই দায়ী করে। তার দায়ভার সম্ভবতঃ আসলেই আমাদের নিতে হবে। ইদানীং দূর্নীতিবাজ যে মানুষগুলোকে প্রায় রুটিন মাফিক প্রতিদিন আটক করা হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই আমাদের প্রজন্মের কিন্তু তাদের মাঝে তারেক রহমান বা লুৎফুজ্জামান বাবরের মতোই পুরোপুরি নীতিহীন নূতন প্রজন্মের মানুষও কিন্তু আছে। যাদের দূর্নীতির কথা প্রায় রূপকথার মতো দেশের মানুষকে জানানো হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই রাজনীতিবিদ, যদিও আমার ধারনা রাজনীতিবিদদের থেকে অনেক বড় দূর্নীতিবাজ আমাদের আমলারা এবং তারা এখনো পুরোপুরি ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন।

আমাদের শত সমস্যার পরও কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। যে মানুষটি যে ক্ষেত্রে কাজ করে তার স্বপ্নটি হয় সেই ক্ষেত্রকে নিয়ে তাই আমি ঘুরে ফিরে স্বপ্নটি দেখি আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি নিয়ে। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে সম্পদ বলতে বোঝানো হতো তেল গ্যাসের খনি, কলকারখানা ইত্যাদি। নূতন সহস্রাব্দে সেটা রাতারাতি পাল্টে গিয়েছে, এখন সম্পদ বলতে বোঝানো হয় মানুষের জ্ঞান। যে দেশে মানুষ যত বেশি সেই দেশ তত সম্পদশালী হতে পারে তার দেশের মানুষগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে। আমরা সেই সুযোগটি এখনও নিই নি– সত্যিকথা বলতে কী আমরা পুরোপুরি এর উল্টোদিকে যাচ্ছি। লেখাপড়ার জন্যে একটি টাকাও যদি খরচ করা হয় তাহলে সেটি সুদে আসলে ফিরে আসে– কিন্তু যারা আমাদের দেশ চালান তারা সেটি বুঝতে চান না। কারণটাও আমরা জানি, লেখাপড়ার টাকা খরচ করলে সেটি সাথে সাথে সুদে আসলে ফিরে আসে না, সেটি ফিরে আসতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়, সেই সময়টুকু কেউ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজী নন। আমাদের দেশের প্রাইমারী স্কুলে প্রায় দুই কোটি ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে– তাদের ভেতরে মাত্র দেড় শতাংশ ছেলে মেয়ে প্রকৃত অর্থে প্রাইমারী শিক্ষাটুকু পায় অন্য সবারই নানা ধরনের সমস্যা। এই ছেলেমেয়েগুলো যখন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করতে যায় তারা কখনই ঠিকভাবে সেটা করতে পারে না। আমরা

www.BanglaBook.org

মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাদের ঝরে পড়তে দেখি, উচ্চ মাধ্যমিকে আবার ঝরে পড়তে দেখি– দেশের জন্যে সেটা যে কতো বড় অপচয় সেটা কেউ কল্পনা করে দেখেছে? মজার ব্যাপার হলো আমরা যদি চেষ্টাচরিত্র করে শুধু প্রাইমারী স্কুলের লেখাপড়ার মান আর অল্প একটু উন্নত করতে পারতাম, সঠিক লেখাপড়ার মান যদি দেড় শতাংশ না হয়ে তিন শতাংশ হতো তাহলেই দেশের লেখাপড়ার মান একেবারে একশ ভাগ বেড়ে যেতো!

স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির এই ছেলে মেয়েরাই আমাদের নূতন বাংলাদেশ। তারা কীভাবে চিন্তা করে, দেশ জাতি সমাজ নিয়ে তাদের আগ্রহ বা কৌতুহল কতোটুকু সেটা আমার খুব জানার ইচ্ছে করে। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখালেখি করি বলে তাদের সাথে আমার এক ধরনের যোগাযোগ আছে, আমার ধারনা তাদের বড় অংশের উপর আমরা ভরসা করতে পারি। খুব চিন্তাভাবনা করে এই প্রজন্মকে আমাদের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে হয়েছিল এবং এটা খুব অস্বাভাবিক নয় বেশ কিছু ছেলে মেয়ে এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আমাদের দেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি না নিয়েই বড় হয়ে গেছে। তাদের ভেতর থেকে একটা স্বার্থপর শ্রেণী তৈরি করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। আমার মনে হয় খুব সচেতনভাবে তাদেরকে এই ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার সময় চলে এসেছে।

তবে যে বিষয়টার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে শিক্ষার ধরণ– আমরা কী এখনো পাশাপাশি তিন রকমের শিক্ষা রেখে যাব? আমি একেবারে লিখে দিতে পারি ইংরেজী মিডিয়ামের একজন ছাত্রী আর মাদ্রাসার একজন ছেলেকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে দেখা যাবে তারা নিজেদের ভেতর কথা বলায় একটা বিষয় পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছে না। একটা দেশের নূতন প্রজন্ম এরকম পুরোপুরি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গঠন নিয়ে বড় হওয়াটা কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। এই দেশে আমরা এরকম একটা বিষয় হতে দিয়েছি সেটা সম্ভবতঃ আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। সবচেয়ে বড় কথা ইংরেজী মিডিয়াম এবং মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীরা কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত মূল্যবোধ নিয়ে বড় হবার সুযোগ পাচ্ছে না। আমাদের খুব বড় দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পর কতোগুলো বছর কেটে গেছে এখনো আমাদের কোনো শিক্ষানীতি নেই। প্রতিটি সরকার হই চই করে একটা শিক্ষা কমিশন তৈরি করে আরা সেই কমিশন একটা রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টগুলো হয় দায়সারা যারা তৈরী করেন তাদেরও তার জন্যে কোনো মমতা থাকে না। গত জোট সরকারের রিপোর্টটি ছিল সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রীয়ভাবে

www.BanglaBook.org

কীভাবে একটা দেশের ছেলেমেয়েদের সাম্প্রদায়িক করে ফেলার চেষ্টা করা যায় সেই রিপোর্টটি তার একটা দলীল হয়ে থাকবে।

এতো কিছুর পরেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বড় সহায় হচ্ছে তার মোটামুটি স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম। নূতন প্রজন্ম এই দেশের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে– এটি সেই প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধকে দেখে নি। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছে এবং যারা দেখে নি তাদের মাঝে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। যারা দেখেছে তারা জানে একটা দেশ পেতে হলে কতো বড় আত্মত্যাগ করতে হয় যারা দেখেনি তারা সেটা জানে না। হয়তো শুনেছে কিংবা পড়েছে কিন্তু সেই সত্যটি তাদের পক্ষে অনুভব করা কঠিন, তারপরেও যারা সেটি অনুভব করতে পারবে তারাই হবে নূতন বাংলাদেশের চালিকা শক্তি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেশে ফিরে আসা

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি দেশে ফিরে এসেছি। যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেশে ফিরে যাব তখন আমেরিকার আমার বাঙ্গালী বন্ধুরা কেউ আমাকে বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করার কথাও না– কারণ দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর পরই নিউ জার্সীতে একটা বাড়ি এবং নূতন চকচকে একটা ভ্যান কিনেছিলাম। যে দেশে ফিরে যাবে সে কেন নূতন বাড়ি গাড়ি কিনে পয়সা নষ্ট করবে? কিন্তু আমার যুক্তিটি ছিল সহজ, দেশে ফিরে গিয়ে কখনোই বাড়ি কিনতে পারব না, সেই অর্থ আমার হবে না। এই দেশে ব্যাংকের টাকা দিয়ে বাড়ি কেনা যায় তাই নিজের বাড়িতে থাকতে কেমন লাগে দেখে নিই। গাড়ি কেনার কারনটাও সহজ, দেশে চলে যাবার আগে শেষবার এই দেশটা একটু ঘুরে দেখতে চাই তাই সবাইকে নিয়ে ঘোরার জন্যে একটা ভ্যান হলে ভাল হয়।

যখন দেশে ফেরার সময় চলে এসেছে এবং সবাই আবিষ্কার করেছে আমি সত্যি সত্যি দেশে চলে যাচ্ছি আমার পরিচিত সবাই আমাকে নানাভাবে এই পাগলামী না করার জন্যে উপদেশ দিতে শুরু করলো। আমার আগে যারা দেশে যাবার চেষ্টা করেছে এবং তাদের জীবনে কী ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে এসেছে সবাই সেই সব কাহিনী আমাদের বর্ণনা করতে শুরু করল। আমি এবং আমার স্ত্রী সেই সব কাহিনী এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে লাগলাম।

দেশে ফিরে যাবার আমার এই সিদ্ধান্তটি সবচেয়ে সহজ ভাবে নিলো আমার কর্মস্থলে আমার বস। আমরা দুজনে মিলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ শেষ করেছিলাম, সে ম্যানেজারের দায়িত্বটা পালন করতো আমি করতাম টেকনিক্যাল কাজ। দুজনের ভেতরে খুব ভাল একটা সম্পর্ক ছিল। সে আমার

www.BanglaBook.org

ঘাড়ে থাবা দিয়ে বলল, 'দেশে যেতে চাইছ যাও। যখনি এক দুই মাসের জন্যে এসে আমাদের রিসার্চ টিমে যোগ দিতে চাইবে, আমাকে শুধু একটা ই-মেইল পাঠাবে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব!' আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম তার এই সাহায্যটুকু আমার সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে।

দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারটি সবচেয়ে সহজ আমার এবং আমার স্ত্রীর জন্যে আমরা আমাদের নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি। সবচেয়ে কঠিন আমার নয় বছরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ের জন্যে তারা একটি ভিন দেশে ফিরে যাচ্ছে। এই অপরিচিত দেশে অপরিচিত পরিবেশে সব কিছুই তাদের জন্যে অন্যরকম। আমেরিকার ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে তাঁদের জন্যে কতো কী করা হয়, কতো যত্নে, কতো ভালবাসায় তাদের বড় করা হয়। বাংলাদেশের স্কুলে কী তার কিছু পাবে?

আমি এবং আমার স্ত্রী বাংলাদেশে এসে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। ছেলে মেয়েদের দিয়েছি একটা স্থানীয় স্কুলে। সেই স্কুলে তাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা কথা লিখতে গেলে বিশাল সহকাব্য হয়ে যাবে। আমার মনে আছে প্রতি রাতে খাবার টেবিলে তারা তাদের স্কুলের ভয়ংকর ভয়ংকর সব ঘটনার কথা বর্ণনা করতো। আমি তাদের বলতাম, 'দেখো তোমাদের স্কুলে পাঠানো হয়েছে যেন কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে আপনার ছেলে মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে তার একটা উত্তর দিতে পারি! তোমাদের স্কুলে গিয়ে কিছু শিখতে হবে না, যা শেখানোর তোমাদের বাসায় শেখাব!'

কাজেই আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতো এবং আসতো এবং লেখাপড়া করতো বাসায়। আমার সবচেয়ে ভয় ছিলো কোনোদিন না তাদেরকে শারীরিক শাস্তি দিয়ে দেয়। সে জন্যে দুজনকেই দুটি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। চিঠি দুটি স্কুল প্রিন্সিপালের উদ্দেশ্যে লেখা, সেখানে বলা হয়েছে আমি আমার ছেলে মেয়েদের স্কুল থেকে সরিয়ে নিচ্ছি তারা আর এই স্কুলের ছাত্র নয় কাজেই এইস্কুল কর্তৃপক্ষের শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নেই। আমার ছেলে মেয়েকে বলে রেখেছিলাম যদি কখনো কোন শিক্ষক তাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হয় তাহলে তার হাতে এই চিঠিটা দিয়ে দ্রুত ক্লাস রুম থেকে বের হয়ে স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করতে।

এই চিঠি দুটোর কারণে আমার ছেলে মেয়ে স্কুলের ভয়ংকর পরিবেশেও টিকে গিয়েছিল। তারা মনে মনে চাইতো কোনো একজন শিক্ষক তাদের শাস্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়ার চেষ্টা করুক তাহলে তার হাতে এই চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে তারা স্কুল থেকে মুক্তি পেয়ে চলে আসতে পারবে।

আমার ছেলে এবং মেয়ে সিলেটের সেই দুঃসহ স্কুলগুলো দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতো কারণ আমি প্রতি বছরেই প্রায় তিন মাসের জন্যে তাদের আমেরিকা নিয়ে এসেছি। আমি আমার পুরানো কর্মস্থলে গবেষণার কাজ করতাম, ছেলে মেয়েরা তাদের পুরানো স্কুলে ফিরে যেতো।

এভাবে কয়েক বছর কেটে যাবার পর সিলেটের মৌলবাদীদের সাথে আমার প্রথম বিরোধটির সূত্রপাত হলো! যেদিন আমার বাসায় তারা বোমা মেরেছে আমি বুঝতে পেরেছি আমার ছেলেমেয়েদের সিলেটে রাখা নিরাপদ নয়। ঢাকায় বাসা ভাড়া করে তাদের ঢাকার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলাম। আমাদের সম্পূর্ণ নূতন একটা জীবন শুরু হলো আমি এবং আমার স্ত্রী সিলেটে, ছেলে এবং মেয়ে ঢাকায়। প্রতি উইক এন্ডে আমরা তাদের দেখতে আসি। তারা বড় হয়ে উইনিভার্সিটিতে পড়ার জন্যে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতি উইক এন্ড ঢাকা-সিলেট করেছি। আমার জানামতে সারা বাংলাদেশে আমার এবং আমার স্ত্রীর মতো এতো ট্রেন ভ্রমণ আর কেউ করে নি। ব্যাপারটি এমন একটি পর্যায়ে চলে গেলো যে একদিন ট্রেনের একজন কর্মচারী আমাকে একটা খাম দিয়ে বলল, 'স্যার আপনার চিঠি!' আমরা এতো নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করি যে লোকজন ট্রেনে আমাদের চিঠি পাঠাতে শুরু করেছে।

আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছি প্রায় এক যুগ হয়ে গেছে। মৌলবাদীরা মোটামুটি ভাবে আমার পিছনে লেগেই আছে। এই মুহূর্তে তারা সারা সিলেট শহরে আমার বিরুদ্ধে একটা পোস্টার লাগিয়েছে। তিন রঙা সেই পোষ্টারে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্ত্তা লিখছে শেষে লেখা আছে আমি এতোই ইসলাম বিরোধী মানুষ যে আমি নাকী একজন মুসুল্লীর দাড়ি কেটে দিয়েছি। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেয়ার একটা অত্যন্ত স্থূল প্রচেষ্টা!

আমি এবং আমার স্ত্রী এই নিয়েই থাকি। আমার স্ত্রী একজন অসাধারণ মহিলা বলে আমি দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। মৌলবাদীদের হাজার রকম উৎপাতে সে কখনোই ঘাবড়ে যায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আমাদের নিজেদের সন্তানের মতো। তাদের কাছ থেকে আমরা যেটুকু ভালবাসা পাই তার কারণে সব ধরনের উৎপাত আমরা তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারি।

যতদিন আমেরিকা ছিলাম আমি আমার শ্রমটুকু দিয়েছি সেই দেশটির জন্যে। এখন আমি আমার শ্রমটুকু দিচ্ছি এই আমার নিজের দেশের জন্যে। এই দেশে কতো কী করার আছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোই একটা বিশাল ব্যাপার– তার বাইরেও একশটা ভিন্ন ভিন্ন কাজ করা যায়। সারা দেশে গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করেছি, ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড শুরু হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের অলিম্পিয়াড শুরু হবে। নানা ধরনের কনফারেন্স, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা শিশু চলচ্চিত্র উৎসব কতো কিছুতে সময় দেয়া যায়। কিছুদিন আগে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ করার একটা আশংকা দেখা দিয়েছিল, সবাইকে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেটাকেও থামানো হয়েছে। ছোট বাচ্চাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনানোর একটা অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছে– ভারী মজার একটি বিষয় সেটি।

সব মিলিয়ে আজকাল মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়, আমার এতো সুন্দর একটা দেশ ফেলে রেখে আমি কেমন করে আঠারো বৎসর আমেরিকাতে রয়ে গিয়েছিলাম!

** সমাপ্ত **

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG